ধানুয়া টোটোর কথামালা
ধনীরাম টোটো

ধনীরাম টোটো ১৯৬৪ সালে টোটোপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আমেপা টোটো ও মা লক্ষ্মিণী টোটো। টোটো জনজাতির নিজস্ব গোষ্ঠী-নির্বাচিত পঞ্চায়েতের শেষ প্রধান ছিলেন আমেপা টোটো। তারপর ১৯৭৭ সাল থেকে সরকারি কাঠামো-নির্ধারিত পঞ্চায়েত চালু হওয়ার মধ্য দিয়ে টোটোদের নিজস্ব গোষ্ঠী-নির্বাচিত পঞ্চায়েত লোপ পায়। আমেপা ও লক্ষ্মিণীর মধ্যম পুত্র হিসেবে ধনীরাম টোটো শিশু বয়স থেকেই টোটো ভাষা-সংস্কৃতি-পরম্পরার সঙ্গে গভীর সংযোগ ও তার প্রতি গভীর অনুরাগ নিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন। প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাধারায় তিনি মাধ্যমিক পাশ। কিন্তু তাঁর আসল শিক্ষা জনজাতির জীবনে প্রবাহিত লোকজ্ঞানের সম্পদকে আয়ত্ত করে তার ভাণ্ডারী হিসেবে কাজ করার মধ্য দিয়েই হয়েছে। টোটো ও বাংলা ভাষায় বহু কবিতা, গান, পুরাকথার গল্প তিনি রচনা করেছেন, যা উত্তরবঙ্গের বহু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। টোটো ভাষা সুষ্ঠুভাবে লেখার জন্য তিনি একটি লিপিও তৈরি করেছেন। তারপর তিনি ব্রতী হয়েছিলেন টোটো জনজাতির ইতিহাসে প্রথম উপন্যাস রচনা করতে। 'ধানুয়া টোটোর কথামালা'-ই হল সেই উপন্যাস। টোটো জনজাতির ইতিহাস, পুরাকথা, প্রকৃতিলগ্ন জীবনসংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও তা ক্ষয়ের যন্ত্রণা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে অনুপম ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে।

ধানুয়া টোটোর কথামালা

ধনীরাম টোটো

সম্পাদনা: বিপ্লব নায়ক

অন্যতর পাঠ ও চর্চা

প্রথম সংস্করণ
নভেম্বর, ২০২১

গ্রন্থসত্ত্ব
ধনীরাম টোটো

প্রকাশক
অন্যতর পাঠ ও চর্চা
১২৫, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড,
কলকাতা- ৭০০০৪৭

মুদ্রণ
ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগণা,
কলকাতা- ৭০০১৩২

প্রচ্ছদ ও পুস্তানি শিল্পী:
ইন্দ্রনাথ মজুমদার

ভিতরের ছবি:
বিপ্লব নায়ক

বিনিময়
১০০ টাকা

পরিচয় কথা

টোটোদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৪৬ সালে কমলালেবুর মরশুমে, তেলিপাড়া চা-বাগানে। কিন্তু আমি প্রথম টোটোপাড়া যাই ১৯৭৫ সালে। তখন টোটোপাড়ার বনজঙ্গলের উপর বহিরাগতদের হাত পড়লেও টোটোজাতির আদি সমাজ-সংস্কৃতির স্থিতাবস্থা অনেকাংশেই বজায় ছিল। টোটোপাড়ার সেই আদিরূপটির প্রতি ভীষণভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়ি। তখন টোটোপাড়া যাওয়ার রাস্তাঘাট সেভাবে নির্মাণ করা হয়নি। যানবাহনও খুব একটা চলত না। সেবার ধনীরামদের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কিন্তু অবসর পেলেই আমি টোটোপাড়ায় গিয়ে যতদিন সম্ভব থেকে আমার কাজ করা শুরু করি।

এরপর আমি একবার একইভাবে টোটোপাড়ায় যাই। থাকি আমার দিদি প্রীতিলতা মানখিন ও জামাইবাবু হেরেন মানখিনের বাড়িতে। তখন শীতকাল। একদিন আমার ভাই ধর্মপ্রসাদ শর্মা চারজন কিশোরকে নিয়ে আমার কাছে আসে। তাদের নাম চিত্তরঞ্জন, ধনীরাম, মুক্তারাম ও ভক্ত টোটো। সেই শীতসকালে উজ্জ্বল কমলারোদের চার কিশোরকে পেয়ে আমি খুব খুশি। কারণ টোটোদের মধ্যে তারা চারজন মাত্র বাংলা বলতে ও লিখতে পারে। এবার তারা হল আমার নিত্যসঙ্গী। সেই পরিচয় এখনও অটুট আছে। তার কয়েকদিনের মধ্যে বুঝতে পারি ঐ কিশোরদের মধ্যে ধনীরাম টোটো একটু আলাদা। বাইরের জগৎ সম্পর্কে তার যেমন অদম্য কৌতূহল, তেমনই টোটোপাড়ার বনজঙ্গল, পাহাড়নদী, বন্যপ্রাণী ও তার স্বজনস্বজাতি সম্পর্কে রয়েছে তার অদম্য আগ্রহ। সেখানকার মাটি ও মানুষ সমানভাবেই তার আপনজন। এভাবে যত দিন যায়, ধনীরামের ততই পরিবর্তন হতে থাকে।

সময়ের পাথর গড়িয়ে তখন টগবগে যুবক, ধনীরাম হাতে কলম তুলে নেয়। আর সময় পেলেই সে চষে বেড়ায় তার আজন্ম লালনভূমি, জন্মভূমি টোটোপাড়ার বনপাহাড়। এভাবে একসময় ধনীরাম নিজেই যেন হয়ে উঠল টোটোপাড়ার নিজস্ব ইতিহাস আর ভূগোলের একক প্রতিভূ। আবার তার মধ্যে উঁকি দেয় শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের চিরায়ত ভাবনা।

সে তার মাতৃসমা টোটোপাড়াকে নিয়ে লেখে সব-হারানোর বেদনাবিধুর কবিতা, গল্প, তাদের টোটোপাড়ায় আগমনের ইতিহাস। সামাজিক রীতিপ্রথার আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে তার লেখনী। খুঁজে বের করে লোককথার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার, লোকগানের পসরা। ধর্মীয় গানের ধারাও চিত্রিত হয় তার লেখনিতে। আর সেসব মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হতে থাকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়।

এসব বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য, সামাজিক অবক্ষয়, জমিহারানো টোটোদের বাস্তব কাহিনিরই চিত্ররূপে সে রচনা করে এই সময় ও সমাজের কথা তার লেখা ‘ধানুয়া টোটোর কথামালা’ উপন্যাসে। এতে আমি বিস্মিত হইনি। তার এই ক্রমবিকাশের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকুক, এই কামনা করি।

বিমলেন্দু মজুমদার
বেগুনটাঁড়ি, জলপাইগুড়ি
৩১।১০।২০২১

বাংলার আদি জনজাতিদের নিয়ে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা ও সন্দর্ভ উপস্থাপনায় বিমলেন্দু মজুমদার একটি সর্বজনশ্রদ্ধেয় নাম। টোটো, রাভা, মেচ, বিড়হোড়, ধিমাল, জলদা এমন বহু জনজাতির মধ্যে দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন ক্ষেত্রগবেষণার উপর নির্মিত তাঁর লেখাগুলি প্রামাণ্য হিসেবে স্বীকৃত। টোটো জনজাতির সঙ্গে তাঁর প্রাণের সম্পর্কটিও অতি গভীর— বয়সের ভার ও গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার ভার সত্ত্বেও এই ‘পরিচয় কথা’-টি লিখে দিয়ে তার প্রকাশই তিনি ঘটিয়েছেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ আমাদের মানায় না, কুন্ঠাভরে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাটুকু অর্পণ করি।

— সম্পাদক।

ধানুয়া টোটোর কথামালা

এক
ধানুয়ার প্রথম মাদারীহাট যাত্রা

১৯৭২ সাল।

ধানুয়া টোটো তার দিদিমাকে বলল, দিদিমা, তোমরা প্রতি রবিবার মাদারীহাটের হাটে যাও, আমাকেও একদিন সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

দিদিমা সুনকরী টোটো বলল, দাদুভাই নিশ্চয়ই যাবে একদিন।

ধানুয়া তারপর তার বাবার কাছে আব্দার জুড়ল, বাবা আমি মাদারীহাট ঘুরতে যাব।

হাসতে হাসতে বাবা বলল, কিরে ধানুয়া, পায়ে হেঁটে মাদারী যেতে পারবি ?

ধানুয়া নিঃসংশয়ে জবাব দিল, দিদিমার সঙ্গে আস্তে আস্তে ঠিক যেতে পারব। দিদিমা তো বুড়ি হয়ে গেছে, তাও যখন তখন মাদারীহাট যায়। আমি যেতে পারব না কেন ? দিদিমা হাট থেকে মোয়া, মুড়ি সব আমাদের জন্য কিনে আনে। আমিও কিনে আনব।

ধানুয়ার বাবা পঞ্চায়েত মুখিয়া। সে বলল, ঠিক আছে, সামনের রবিবার তোর দিদিমার সঙ্গে যাস।

ধানুয়া দিদিমার কাছে গল্প শুনেছে অদ্ভুত এক গাড়ির। লোহার চাকাওলা সে লোহার গাড়ি নাকি লোহার দুটো সরু পাতের উপর দিয়ে ছোটে। আর কি লম্বা সে গাড়ি। এত লম্বা যে উঠোনসমেত তাদের গোটা বাড়িটাকে নাকি পাঁচ পাকে ঘিরতে পারে। ধানুয়ার আর বিশ্বাসই হয় না— গাড়ি এত লম্বা হতে পারে ? দিদিমা বলে, হ্যাঁরে দাদু, আমি ট্রাক- বাস- জিপ- মোটর সবরকম গাড়ি দেখেছি, কিন্তু ওই লম্বা লোহাগাড়ি দেখে আমিও কি কম অবাক হয়েছি। ধানুয়া ইস্কুলে ক্লাস টু-তে পড়ে। স্কুলে শুনেছে ও গাড়িকে বলে ট্রেনগাড়ি। মাস্টার বলেছিল ও গাড়ির মাথা থেকে ধোঁয়া ওড়ে আর কু-

ঝিক-ঝিক আওয়াজ করে দৌড়য়, গায়ে গায়ে আঁটা বগি একসাথে দৌড়য় এত জোরে যে একটার সাথে আর একটাকে আলাদা করা যায়না, সংখ্যা গোনা তো দূরের কথা। মাদারীহাট গেলে ওই গাড়ি দেখা যায়। তাই জন্যেও ধানুয়ার এত ইচ্ছা মাদারীহাট যাওয়ার।

বাবার সম্মতি পেয়ে তো ধানুয়া খুব খুশি। সামনের রবিবার সে দিদিমার সঙ্গে মাদারীহাটের হাটে যাবে, যা তার দাদা-দিদিরাও কেউ এখনও যায়নি। ধানুয়ার মনে খুশির শেষ নেই, কেবল অপেক্ষা কখন রবিবারের সকালটা আসে।

আজ সেই রবিবার। সকালে বাবা তার হাতে তিন টাকা দিল— তিনটে এক-টাকার কাগজের নোট। ধানুয়ার কাছে এর মূল্যের কোনও সীমা নেই। বাবা তাকে আজ নিজের হাতে এই নোটগুলো নিজের মতো করে খরচ করতে অধিকার দিয়েছে। এও তো এই প্রথম, আর এও তো কত বড় ব্যাপার।

ভোরবেলা দিদিমার সাথে মাদারীহাটের পথে যাত্রা শুরু করল ধানুয়া। ওরা দুইজন ছাড়াও টোটোপাড়া থেকে আরও বেশ কয়েকজন একসাথে চলল। টোটোপাড়া থেকে মাদারীহাটের পথ তেইশ কিলোমিটার বন-জঙ্গল পেরিয়ে, একের পর এক নদীখাত পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে। পথে অবশ্য কয়েকটা পাড়া পড়ে। প্রথমে হল্লাপাড়া— বরালি ভগত জোত। তারপর তিতি নদী পেরিয়ে হান্টাপাড়া। সব ছাড়িয়ে হাঁটা আর হাঁটা। কত দূরের পথ। দুপাশে কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল। কত না পাখি। বনের পথে হরিণ রাস্তা পার হয়ে যায় একছুটে। ধানুয়া দেখে অবাক চোখে।

ধানুয়া দিদিমাকে জিঞ্জাসা করে, দিদা এ জঙ্গলে বাঘ আছে ?

দিদিমা বলল, ও তো রাতে শিকার করে। এখন দিনে ও ঘুমোয়। তবে ওর নাম নিতে নেই।

ধানুয়া ফিরে জিঞ্জাসা করে, কেন নাম নিতে নেই ?

দিদিমা বলে, ও বনের রাজা, ওকে নিজের মতো থাকতে দিতে হয়, ওর খোঁজখবর বেশি নিতে নেই। তারপর দিদিমা তাড়া লাগায়, চল, চল, সবাই এগিয়ে যাচ্ছে, একসাথে যেতে হবে, আর তাছাড়া বাজার করে এত দূরের পথ তো আবার অন্ধকার নামার আগে ফিরতেও হবে।

ধানুয়া পা চালায়। কিন্তু পথ যে আর শেষই হয়না। রাস্তার পাশে কোনও ঘরও নেই যে জল চেয়ে খাবে। তৃষ্ণায় গলা কাঠ হয়ে এল ধানুয়ার।

অবশেষে মাদারীহাটের হাটের চালাগুলো দূর থেকে দেখা গেল। অজানা অচেনা পথ শেষে অজানা অচেনা মাদারীহাটে এসে ধানুয়া পৌঁছাল।

হাটে পৌঁছে ধানুয়া দিদিমাকে বলল, কোনও দোকান থেকে একটু জল দাও, গলা শুকিয়ে গেছে।

দিদা হেসে সামনের দোকানীকে বলল, আমার দাদুভাইকে একটু জল দাও না গো।

দোকানী হেসে এক ঘটি জল বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, আরে দাদি, আজ ছোট দাদুকে হাটে নিয়ে এসেছ, দাদুকে কী দেখাবে গো ?

দিদা হাসতে হাসতেই বলে, আরে দাদু তোমাদের লম্বা লোহাগাড়ি দেখার জন্য অনেকদিন ধরে অস্থির তাই আজ চলে এল।

মাদারীর হাটের অনেক দোকানীদের সঙ্গেই দিদিমার ভালো আলাপ-পরিচয়। কত লোক সেখানে, কত দোকান। মানুষের কথার আওয়াজ একটানা বাজে। কত ভাষায় কথা হচ্ছে। সব ভাষার সব কথা ধানুয়া বুঝতেও পারেনা। তবু ধানুয়া অবাক হয়ে সব শোনে কান পেতে। সবকিছুই দেখতে চায় যেন কিছু না চোখ এড়িয়ে যায়।

চেনা এক দোকানীর কাছ থেকে দিদিমা পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে চিঁড়ে, গুড় আর দই কেনে। তারপর ভালো করে তা মেখে ধানুয়াকে খেতে দেয়। হাটের মাঝে বসে ধানুয়া খেতে শুরু করে। কত যে খিদে পেয়েছিল এতক্ষণ উত্তেজনায় টের পায়নি। এখন সুস্বাদু মণ্ড গলা দিয়ে পেটে যেতেই পরম তৃপ্তিতে তার দেহ-মন ভরে ওঠে।

দিদিমা ঘুরে ঘুরে বাজার করছে, দোকানীদের সঙ্গে গল্প করছে তার চেয়ে বেশি। ধানুয়াও দিদিমার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে পছন্দ করে মোয়া, মুড়ি, শাক-সবজি কিনল। তার খরচ হল দুই টাকা। এক টাকা বাঁচিয়ে রেখে দিল। পকেটে এক টাকা থাকা মানে তো যখের ধন সঙ্গে থাকা।

হাটের সমস্ত আওয়াজ হঠাৎ ডুবে গেল বিপুল শব্দের আলোড়নে। ক্রমশঃ তা জোর থেকে আরো জোর হচ্ছে। হাটের অদূরে রেললাইন। লোহার পাত পাশাপাশি অন্তহীন রেখা তৈরি করে চলে গেছে। ফিরে ফিরে ধানুয়ার নজর সেদিকে ঘুরে ঘুরে আসছিল। এখন সেই রেললাইনের থেকেই যেন

আওয়াজটা আসছে, কিন্তু ঠিক কোথা থেকে আসছে বলা মুশকিল। ধানুয়া সমস্ত মনপ্রাণ এক করে এখন সেদিকে তাকিয়ে আছে। আওয়াজটা বাড়তে বাড়তে হঠাৎ দূরে রেললাইনের উপর দেখা দিল একটা থ্যাবড়া মুখ। সব কল্পনাকে হার মানায় এমন বিশাল এক ভোঁতামুখো লোহার সাপ যেন বীভৎস গর্জন করতে করতে তীরবেগে ছুটে আসছে। তার বিষ-নিশ্বাস কালো ধোঁয়া হয়ে ভোঁস ভোঁস করে আকাশের দিকে ছুটে যাচ্ছে। মাটি যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। তীব্রবেগে ধেয়ে চোখের সীমার বাইরে চলে যাওয়ার পরও তার গর্জন রয়ে গেল। ধীরে ধীরে সে গর্জন মিলিয়ে যাওয়ার পর আকাশ-বাতাস যেন আবার থিতু হল। এই তবে লম্বা লোহাগাড়ি, বা রেলগাড়ি, বা ট্রেন।

দুই
ধানুয়ার বাবার কথা

বাড়ি ফিরে বাবার কাছে ধানুয়া লম্বা লোহাগাড়ি দেখার কথা বলে জিগ্যেস করল ও গাড়ি কোথায় যায়।

বাবা তখন দিনের কাজ সেরে এসে ঘরের বারান্দায় বসে দূর হিসপা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল। ধানুয়ার প্রশ্ন শুনে আনমনা ভাবেই বলল, অনেক দূর যায় বাবা।

এতটুকুন উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে ধানুয়া বলল, ওই তোরসা নদী যতদূরে যায় তার চেয়েও দূরে ?

বাবা আনমনা ভাব কাটিয়ে উঠে হেসে বলল, তোরসা তো যায় আরও নদীদের সঙ্গে মিলতে, তারপর সবে মিলে যায় অকূল সাগরে, যেখানে কাছে-দূরের কোনও মাপ হয়না, বাবা। ট্রেনগাড়ি যায় দূরের সব বড় বড় শহর-রাজধানীতে। শুনেছি দেশের অনেক রাজধানী আছে, বাবা। আমাদের রাজ্যের রাজধানীর নাম কলকাতা। আবার দেশের রাজধানী দিল্লি। আরো কত শহর আছে— বোম্বাই, মাদ্রাজ...। বাবুরা সব ওই শহরে থাকে, একখান থেকে আরেকখান যাতায়াত করে। তাছাড়াও বাবুরা যায় দার্জিলিঙ, কাশ্মীরের মতো আরো কত দূরে দূরে ধান্দা করতে, আমোদ করতে। ট্রেনগাড়ি বাবুদের নিয়ে ওই দূরে দূরে ছোটে।

ধানুয়ার কাছে সবই আবছা অস্পষ্ট ঠেকে। বড় শহর, শহরের বাবু কিছুই যেন ঠিক মনের নাগালে ধরতে পারেনা। বড় শহর মানে কি মাদারীহাটের মতো কিছু ? বাবু মানে কি তাদের স্কুলের মাস্টারদের মতো কেউ ? সে আবার প্রশ্ন করে, বাবুরা যায়, আমরা যাই না ?

চারদিকের ঘন হয়ে আসা ছায়ায় দূরের পাহাড়ের গায়ের জঙ্গলের সবুজ রঙ ঘন হতে হতে প্রায় কালো হয়ে যাওয়ার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ধানুয়ার বাবা বলল, আমরা টোটোপাড়ায় থাকি, আমাদের ওসব জায়গায় যাওয়া বড় বিপদ।

ধানুয়ার যেন আরও সব গুলিয়ে গেল। মাদারীহাট যাওয়ায় কোনও বিপদ না থাকলে, ওসব জায়গায় যাওয়া বিপদ কেন ? বাঘ-ভাল্লুকের ভয় ? কিন্তু তাই বা কী করে হয় ? টোটোপাড়াই তো ঘন জঙ্গলের মধ্যে, আর সে জঙ্গলে বাঘ, পাইথন, হাতি কী না আছে। সেসব বনের পশুর সঙ্গে সেই কবে থেকেই তো টোটোরা মিলেমিশে বেঁচে আসছে, শহরে তাহলে ভয় কীসের ? শহরের জঙ্গলের বাঘ-ভাল্লুকরা কি অনেক বেশি মানুষখেকো ? মুখ ফুটে সে প্রশ্নই করে বসে বাবাকে, কেন বাবা, শহরের জঙ্গলে অনেক মানুষখেকো ?

ধানুয়ার বাবা হেসে ওঠে। বলে, আরে না রে, ওখানে জঙ্গল কোথায়, সব জঙ্গল কেটে ওরা সাফ করে দিয়েছে ওসব জায়গায়, তাই বাঘ-ভাল্লুক ওখানে নেই। আছে লোক আর লোক, লোকের ভিড়। সে লোকের ভিড় খালি এদিক-ওদিক ছুটছে। সে ভিড় স্থির হতে দেয় না, কোথায় যে ঠেলেঠুলে নিয়ে যায়। তার ঠেলায় কোথায় যে হারিয়ে যাবি, নিজেকে আর খুঁজে পাবিনা।

উত্তর মেলার বদলে ধানুয়ার মনে আরও প্রশ্নের জন্ম হয়। দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া চারদিকের ঢেউখেলানো পাহাড় আর জঙ্গলের ছায়াঘন বিস্তারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভাবে কেমন করে এইসব জঙ্গল কেটে কেউ সাফ করতে পারে। আর জঙ্গল সাফ হয়ে গেলে পড়ে থাকবেটা কী ? নদীর জল শুকিয়ে গেলে যেমন পাথরভর্তি মরা খাত পড়ে থাকে তেমনটাই কি ? আর সেখানে মানুষ বাঁচবে কী করে ? কোথা থেকে শাক-সবজি-কন্দ সংগ্রহ করবে, কোথায় চাষের ক্ষেত বানাবে, কোথা থেকে খড়ি নিয়ে আসবে, ঘর বানাবার কাঠই বা কোত্থেকে পাবে ? অবাক জিজ্ঞাসার সঙ্গে ধানুয়ার মনে শহর সম্পর্কে কিছু ভয়ের শিহরণও যেন তৈরি হয়।

আরেক দিন। স্কুল থেকে ফিরে এসে ধানুয়া বাড়ির পোষা শুয়োর ও পোষা মুরগিগুলোর পিছনে ধেয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল উঠোন জুড়ে। বাবা বাড়ি ফিরল। দুশ্চিন্তার ছায়া যেন হঠাৎ বাবাকে অন্যমনস্ক করে তুলেছে, বারান্দায় উঠে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসল মৃদু হয়ে আসা বিকেলের আলোর

মধ্যে দৃষ্টি মিশিয়ে দিয়ে। জারানো মারুয়া ভর্তি কাপড়ের পুঁটলি নিঙড়ে ইউ তৈরি করে নিয়ে এসে বাবার পাশে বসল মা। বাটি ভর্তি ইউ বাবার হাতে তুলে দিল, নিজেও নিল। এক চুমুক দিয়ে বাবার দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, আজ সভায় কী হল ?

বাবা যেন অন্যমনস্কতা কাটিয়ে ফিরে ইউয়ে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, হড়কে আর কাজির ক্ষেতিজমি নিয়ে বিবাদের বিচার হল। পাঁচজনের বিচার তারা তো মেনে নিল, কিন্তু আলিপুরদুয়ার থেকে আজ সরকারি কুঠির অফিসার বাবুরা এসেছিল, তারা সব নতুন আদবকায়দা মানার কথা বলছে। বিচার শেষ হওয়ার পর তারা কাগজপত্রে ইংরেজি ভাষায় কীসব লিখল, তারপর বলল যে পঞ্চায়েতের আলোচনা ও বিচারের সব প্রমাণ এখন থেকে এভাবে লিখিতভাবে কলকাতার সরকারের কাছে পাঠাতে হবে। মানুষ মরে গেলেও লেখায় এ প্রমাণ থেকে যাবে, তা অনুযায়ী পরে সব হবে। এই বলে সে লেখায় আমায় সই করে দিতে বলল মুখিয়া হিসাবে। কিন্তু শুধু আমি কেন, আমরা কেউই তো ওই ভাষা কিছুই বুঝি না, আমাদের কথা কী তারা বুঝল আর কী লিখল তা আমরা বুঝব কীভাবে ? আমাদের টোটো ভাষাও তো ওই বাবুরা কিছুই বোঝেনা। যদি তারা কিছু ভুল বোঝে বা ভুল লেখে তাহলে কলকাতার সরকারের কাছে তো ওই ভুলটাই ঠিক হয়ে যাবে আর আমাদেরও পরে সেই ভুলকেই ঠিক বলে মানতে বলবে। কিন্তু মুখিয়া হিসাবে আমাকে তো সই করতেই হল। কিছু ক্ষতি করে ফেললাম কিনা কে জানে।

ধানুয়া বারান্দার নিচে একটা ছোট ছাগলের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে খেলতে খেলতে বাবার কথাগুলো শুনছিল। তার স্কুলে ইংরেজি, বাংলা ভাষা পড়ায়, ক্লাসে বহু চেষ্টা করেও তা সে পুরোপুরি বুঝতে পারেনা। আর তার বাবা-কাকা-জেঠারা তো কোনওদিন এমন স্কুলেও পড়েনি, তাদের পক্ষে তো তা বোঝা আরোই মুশকিল। সে শুনল মা বাবাকে বলছে, অফিসার বাবুদের আমাদের ভাষায় বুঝিয়ে দিতে বল সই করার আগে।

বাবা হেসে বলল, বাবুরা আমাদের ভাষা শিখে সে ভাষায় বুঝিয়ে দেবে—তা হওয়ার নয়কো ধানুয়ার মা। বাবুরা তাদের নিজেদের ভাষার তুলনায় আমাদের ভাষাকে অনেক ছোট করে দেখে। আমাদের যেমন বুনো-জংলি বলে গাল দেয়, আমাদের ভাষাকেও গাল দেয়। সরকারের ভাষা বুঝতে গেলে আমাদেরই ওদের ভাষা শিখে নিতে হবে।

বাবার গলায় যেন ধানুয়া শুনতে পায় এক অপমানিতের ক্ষোভ ও বেদনার সুর। তা ধানুয়ার মনকে দুঃখে ভরে দেয়। তার বাবার মতো প্রাচীন দিনের কথা আর কজন জানে, জঙ্গলের গাছ-লতা-গুল্ম-কন্দ বাবার থেকে ভালো কে চেনে, তিস্তার স্রোত সাঁতরে পার হওয়ায় বাবার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে কজনা, ওই বাবুরাই কি পারবে ? তাহলে ওই বাবুদের কাছে বাবাকে অপমানিত হতে হবে কেন ?

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। বারান্দায় উঠে কুপির আলোর সামনে স্কুলের বই নিয়ে বসল ধানুয়া। বাবা তার পাশে এসে বসল। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, তোকে নিয়ে আমার অনেক আশা রে ধানুয়া। তোর দাদুও ছিল পঞ্চায়েত মুখিয়া আর টোটোপাড়ার জঙ্গলে তার সঙ্গে বাঘের লড়াই হয়েছিল। বাঘও তাকে হারাতে পারেনি। তোর দাদু গেন্দ্রা টোটো সেই লড়াইতেও জিতেছিল। সে গল্প আজও সবাই করে। তোকেও টোটোজাতির নাম উজ্জ্বল করতে হবে। তুই ভালো করে পড়াশোনা কর, এই লড়াইয়ে তোকে জিততে হবে।

তিন
ইস্কুল

বড় মাস্টারের পিছনে পিছনে ধানুয়া স্কুলে যায়। বড় মাস্টার বাঙালি বাবু, আলিপুরদুয়ার থেকে আসেন। সরকার তাকে টোটোপাড়ায় পাঠিয়েছে টোটো বাচ্চাদের পড়াশোনা শেখাতে। বড় মাস্টার না বোঝেন টোটো ভাষা, না বড় মাস্টারের ভাষা বোঝে টোটোরা। স্কুলের ক্লাসঘরে ছেলেমেয়েদের বসিয়ে মাস্টারমশাই হাঁকেন, অ– আ ... ক– খ..। টোটো ছেলেমেয়েরাও একসাথে চিৎকার করে পিছু পিছু বলে, অ– আ ... ক– খ..। এভাবে চলে বর্ণমালা পরিচয়। তারপর মাস্টারমশাই চান শব্দপরিচয় ঘটাতে। একইভাবে হেঁকে হেঁকে বলেন, ক আর র কর, ধ আর র ধর,...। টোটো ছেলেমেয়েদের এবার ঠিকমত উচ্চারণ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। তাদের গলার স্বর একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে অর্থহীন ধ্বনি তৈরি করে, ধীরে ধীরে এক এক করে তারা হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে যায়। মাস্টার নিজেই বক বক করে যান, আকার ইঙ্গিত করে তাঁর কথার মানে বোঝাতে চান। অবোধ্য ধ্বনি সহযোগে এই হাত-পা নাড়া দেখে কেউ হেসে ফেললে বা অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে মুখ ঘোরালে মাস্টার প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে সেই অপরাধীকে শক্ত একটা লাঠি দিয়ে আপাদমস্তক পেটান, কান ধরে ওঠবোস করান। সবাই তাই কিছু না বুঝলেও মাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, মাঝে মাঝে মাথা নাড়ে।

বছর ঘুরলে মাস্টার একদিন পরীক্ষা নেয়। কেউ পাশ করে, কেউ ফেল করে। আবার নতুন ক্লাসের পড়া শুরু হয়।

মাস্টারমশাই সুর করে পদ্য আবৃত্তি করেন,

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি

সারাদিন আমি যেন ভালোভাবে চলি...

মাস্টারের পিছু পিছু বলে এ পদ্য মুখস্থ করে নিতে হবে। অর্থ না বোঝা শব্দগুলো ধানুয়ার কিছুতেই মুখস্থ হতে চায়না। অথচ ধানুয়ার কত গান, পদ্য, এমনকি গল্প অবধি বাবা বা ঠাকুরমার মুখে শুনে শুনে সহজেই মনে থেকে যায়। টোটোরা তো না জানি সেই কতদিন আগে থেকে বাপ-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমাদের মুখে শুনে শুনে টোটোদের অতীতকথা, ভগবান সেংজা-র কথা, হিসপা-পুদুয়া পাহাড়ের কথা, জঙ্গল-সংগ্রহ আর চাষের কথা, আরো কত গান-ছড়া মনে রেখে আসছে, আবার মুখে শুনিয়ে শুনিয়েই তাদের ছেলেমেয়েদের মনেও রেখে যাচ্ছে। অথচ ধানুয়ার মুখস্থ না হলেই মাস্টার ইঙ্গিত করে মাথা দেখিয়ে বোঝাতে চান যে টোটোদের মাথায় কিছু নেই। ধানুয়ার খুব দুঃখ হয়, রাগও হয়। মনে মনে সে বলে, মাস্টার একবার তাদের চাষ করার গানটা মুখস্থ করে গেয়ে দেখাক তো।

পড়া না পারার জন্য স্কুলে আজ ধানুয়াকে মাস্টারমশাই মেরেছে। আকার-ইঙ্গিতে বলেছে যে ধানুয়ার স্থান স্কুলে নয়, জঙ্গলে। ধানুয়ার মন খুব খারাপ। আরও মন খারাপ এজন্য যে তার এই অপমানিত হওয়ার সময় অন্য ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ বিশ্রীভাবে হাসছিল, যেন তারা খুব মজা পাচ্ছে। বাড়িতে ফেরার পথে তার দুই চোখ জলে ভরে উঠেছিল। বাড়ির উঠোনে পৌঁছে দেখল মা যেন তারই পথ চেয়ে বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মা মনে হয় স্কুল-ফিরতি কারও মুখে ধানুয়ার মার খাওয়ার খবর পেয়ে গেছে ধানুয়া ফেরার আগেই।

ধানুয়া প্রাণপণে চোখের জল চাপার চেষ্টা করছিল, কিন্তু মায়ের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই তার ভিতর থেকে যেন হু হু করে বর্ষার নদীর হড়পা বান ছুটে এসে তার দুই চোখ ভাসিয়ে দিল।

মা বারান্দা থেকে নেমে এসে ধানুয়াকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, আরে ধানুয়া কাঁদছিস কেন ?

ধানুয়া রুদ্ধ হয়ে আসা স্বরে কোনওমতে বলল, আমি পড়া পারি নি, মা। মাস্টার মেরেছে। বন্ধুরা হেসেছে। মাস্টার বলেছে স্কুলে না গিয়ে জঙ্গলে যেতে।

মা গায়ের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে ধানুয়াকে বারান্দায় উঠিয়ে বসাল। গায়ের কাপড়ের আলগা খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিল। গায়ে

মাথায় আদরের হাত বোলাতে বোলাতে বলতে লাগল, একটা পদ্য মুখস্থ করতে পারিস নি তো কী হয়েছে, পাগল। তুই নিজে একদিন কত কত কবিতা তৈরি করবি। লোকে তোর কবিতা শুনতে আসবে। তুই টোটোপাড়ার নাম উজ্জ্বল করবি। পঞ্চায়েত মুখিয়া তোর বাবা, আমি তোর মা— আমরা হয়ত সেদিন থাকব না, তবু ওই হিসপা পাহাড়ের ওপরের আকাশের ওপার থেকে আমরা সব দেখতে পাব। সেংজা দেবতা তোর জন্ম দিয়েছে টোটোদের দুঃখকষ্ট দূর করার জন্য। দুঃখকষ্টের বোঝা কত বয়ে নিয়ে গিয়ে তোরসায় ভাসিয়ে দিয়ে আসতে হবে তোকে, সেংজা সব বোঝা হালকা করে দেবে। তার জন্য তোকে ইস্কুলেও পাশ দিতে হবে। তবে না বাবুদের অপমানের জবাব দিতে পারবি। সেংজার বরপুত্র তুই...

মায়ের আদরের স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গলার স্বর যেন এক স্বপ্নভরা গানের মতো ধানুয়াকে ঘিরে ধরে। ধানুয়ার লজ্জা-অপমান-কষ্ট সব মিলিয়ে যায়। মায়ের বুকের মধ্যে আরও ঘন হয়ে বসে ধানুয়া। অজানা ভাষা, সহানুভূতিহীন মাস্টার...— কোনও বাধাই আর বড় মনে হয়না, মনে হয় স্কুলে তাকে পাশ দিতে হবেই...

চার
জঙ্গল-সংগ্রহ

লঙ্কাপাড়ার জঙ্গলে গরুর পাল চরতে ঢুকেছে। সকালের এখনও আড় ভাঙেনি। গরুর পাল ও তাদের রাখালদের পিছু পিছু ঢুকেছে আরও কয়েকজনের সঙ্গে ধানুয়া আর তার মা। তাদের সকলের পিঠে বাঁধা বেতের লম্বাটে বড় ঝুড়ি। পাড়ার অন্যান্য ঘরের মেয়েদের সঙ্গে গল্প-হাসি-ঠাট্টায় মেতে মা। সেই মৃদু কলতানে ভাসতে ভাসতে ধানুয়া চলেছে বনে। জ্বালানী কাঠ আনতে হবে, আর সবজি-মূল-কন্দ সংগ্রহ করতে হবে। দিদিমা আর মায়ের সাথে ধানুয়া আগেও এসেছে বেশ কয়েকবার। দিদিমাই তাকে জঙ্গলে ঘুরে ধরে ধরে চিনিয়েছে কোন লতা-শাক-ফল খাওয়ার জন্য সংগ্রহ করা যায়, শিখিয়েছে কীভাবে উপর থেকে মাটির চেহারা দেখে বোঝা যায় যে তার নিচে ভালো কন্দ আছে। দিদিমার কিছুদিন হল শরীর ভালো নেই। আজ আসার সময় ধানুয়াকে ডেকে বলে দিয়েছে চুরুসাই ও মুরুংসাই লতা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে, তা থেকে দিদিমা নিজের জন্য ওষুধ তৈরি করে নেবে। ঝোপেঝাড়ে লতানে গাছ হিসাবে গজায় চুরুসাই, নজর করে তাদের খুঁজতে হয়। মুরুংসাই অবশ্য সহজেই চোখে পড়ে কারণ বড় বড় গাছের গায়ে পাক দিয়ে ওঠে এই লতা। জঙ্গলের মধ্যে প্রথম খাড়াইটার শেষদিকে বেশকিছু ডালপালা ভেঙে পড়ে ছিল। পাতাং দিয়ে সেগুলো টুকরো করে ঝুড়িতে ভরছিল সবাই। সেখানেই ধানুয়ার চোখে পড়ে গেল খাদের দিকের ঝোপঝাড়ের মধ্যে চুরুসাই। ধানুয়া ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে সেদিকে এগোতে লাগল। মুখ ঘুরিয়ে দেখে মা বলল সাবধানে পা ফেলে যেতে কারণ ওদিকে আলগা পাথরমাটি আছে। তিন-চার গোছা চুরুসাই ঝুড়িতে নেওয়ার পর ধানুয়ার চোখে পড়ল যে ঝোপ পেরিয়ে বড় গাছের নিচের

পিছল ঢালু জায়গাটায় লালচে ছত্রাক গজিয়েছে। আরে, এতো দুদরুমসাই, দারুণ খেতে। গাছের গুঁড়িতে হাতের বেড় দিয়ে টাল সামলে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে ধানুয়া দুদরুমসাইগুলোকেও তুলে পিঠের ঝুড়িতে নিল। মায়েদের তখন ঝুড়িতে কাঠ ভরা হয়ে গেছে, তাকে ডাক দিল। ধানুয়া ফিরে এল, সবার সঙ্গে আবার পা বাড়াল। আজ সে খুব খুশি, আজকের জঙ্গল-সংগ্রহের শুরুটা খুব ভালো হয়েছে...

সূর্য এখন আকাশের বেশ উপরে উঠে গেছে। ধানুয়াদের জঙ্গল-সংগ্রহ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এখন তারা বিশ্রামের জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে ডয়ামারা গুহার নিচে পাহাড়ি নদীর ধারে। নদীর ঠান্ডা জল ঘাড়ে-মুখে-হাতে দিয়ে কয়েক আঁজলা পান করলেই শরীর আবার তরতাজা। এখানেও নদীর ধারে কেরংসাইয়ের ঝোপ গজিয়েছে। কেরংসাই বাবার প্রিয় খাবার। ধানুয়া কেরংসাইও বেশ কিছু গোছা তার ঝুড়িতে ভরল। তার ঝুড়িতে সত্যিই আর জায়গা নেই। দিদিমার ওষধি, শাক-ফল-কন্দ খাদ্যদ্রব্য, শুয়োরকে খাওয়ানোর জিনিস— সবে ভরে উঠেছে ধানুয়ার ঝুড়ি। মায়েরা এখন সংগ্রহ করা ফল-কন্দ খেতে খেতে খোশমেজাজে গল্প জুড়েছে। ধানুয়া কয়েকটা কন্দ নদীর জলে ধুয়ে তা নিয়ে উঠে গেল ডয়ামারা গুহার মধ্যে।

এই ডয়ামারা গুহা ধানুয়ার খুব ভালোলাগার জায়গা। ছোট্ট এই গুহাটি প্রকৃতি তার আশ্চর্য খেয়ালে যে কী অপরূপ সাজিয়েছে। গুহার মেঝেটি পাথরের উপর পাথরের স্তরে যেন একটা বেদি তৈরি করেছে। আর গুহার ছাদটি উঁচু থেকে ঢালু হয়ে নেমে এসে মিশেছে মেঝেতে। সেই ছাদ জুড়ে পাথর আকৃতি নিয়েছে সার সার গরুর বাঁটের মতো, যার মুখ দিয়ে জল চুঁইয়ে আসে খুব ধীরে। এই বাঁটের আকৃতির পাথরগুলোর রঙ কোথাও সবজেটে, কোথাও বাদামি, কোথাও বা কালচে খয়েরি। গুহার ভিতরটা সবসময়েই অতি শীতল। এখানে এসে বসলেই ধানুয়ার শরীর জুড়িয়ে আসে আর মন যে পাখা মেলে বাধাহীন কোন শূন্যে উড়ে যায়!

ধানুয়ার মনে আসে যে কত যুগ ধরে তারই মতো কত টোটো এখানে এসে বিশ্রাম নিয়েছে, শরীর ও মন জুড়িয়েছে জঙ্গল-সংগ্রহের ফাঁকে। দিদিমার কাছে শুনেছে যে দিদিমা যখন ছোট ছিল, তখন টোটোরা সাত-আটজনের দল বেঁধে পুরুষ-মহিলা মিলে প্রায় কুড়ি-ত্রিশ দিনের জন্য জঙ্গল-সংগ্রহের লম্বা অভিযানে বেরোত, তাকে বলা হতো টুংচা-হওয়া। তখন বিরাট বনাঞ্চল জুড়ে টোটোরা সংগ্রহ করতে করতে ঘুরত, সে অভিযানের

সময় জঙ্গলেই অস্থায়ী ঝুপড়ি বানিয়ে অথবা এমন প্রাকৃতিক গুহায় রাত কাটাত। এখনের থেকে তখন জঙ্গল ছিল আরও বড়, আরও প্রাকৃতিক সম্পদে অফুরান। সে জঙ্গলের অনেক এখন কাটা পড়ে সাফ হয়ে গেছে, অনেক জঙ্গলে এখন টোটোরা আগের মতো ঢুকতে পারেনা ভুটান ও ভারত সরকারের বিধিনিষেধে। সেইসব টুংচা-হওয়ার দিনগুলো দিদিমার কথায় যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে ওঠে। এই ডয়ামারা গুহার সঙ্গেও দিদিমার কত স্মৃতি জড়িত। টোটোদের কাছে এই ডয়ামারা গুহা একটি পবিত্র স্থান। কিন্তু কেবল তাই-ই নয়। এরসঙ্গে জড়িত দিদিমার অনেক স্মৃতি যেন অন্য এক অপরূপ রঙে রঙিন। জঙ্গল সংগ্রহের ফাঁকে হোক বা এমনিই হোক, এখানে এসে একান্তে বহু টোটো যুবক-যুবতী নিজেদের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসার ফুল ফুটে উঠতে দেখেছে। এই ডয়ামারা গুহাতে বসেই একদিন যখন দিদিমা অতীতের কথা বলছিল, তখন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে ওঠা দিদিমার মুখ যেন বয়সের ভার সরিয়ে তরুণীর মতো হয়ে উঠেছিল, আর সে মুখের পটে খেলা করছিল গহন গোপন কত স্মৃতিরেশ...

মা এবং তার সাথীরা বিশ্রাম সাঙ্গ করে আবার ঝুড়ির দড়ি কপালে লাগিয়ে ঝুড়ি পিঠে তুলে নিয়েছে, ধানুয়ারও ডাক পড়ল। এবার ঘরে ফেরার পথ ধরতে হবে।

পাঁচ
জমি খোয়া যাওয়া

টোটোদের জমি নিয়ে ধানুয়ার বাবার চিন্তা-উদ্বেগ লেগেই থাকে। কেবল তার বাবার মনেই নয়, টোটোদের গ্রাম-মণ্ডলের সভায় প্রায়ই এ নিয়ে উদ্বিগ্ন আলোচনা হয়। ধানুয়া তা বুঝতে পারে আর তাই উদ্বেগ-চিন্তার কারণ বোঝার চেষ্টা করে বাবা আর মায়ের নিজেদের মধ্যে কথা বা অন্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা যা কানে আসে তার থেকে।

পাহাড়ের ঢালে তাদের চাষের জমিতে মকাই ফলেছে। মা, বাবা-র সঙ্গে সেও হাত লাগিয়েছিল মকাই তোলার কাজে। দিন ঢলে এসেছে। মকাই তোলার কাজ শেষ। সব বেঁধেবুধে চারটে বোঝা তৈরি হয়েছে। এক বোঝা মকাই নিয়ে বাবা ঘরে রওনা দিয়েছে। বাড়িতে রেখে বাবা ফিরে এলে মা ও বাবা দুই বোঝা নিয়ে একসাথে রওনা হবে। ধানুয়ার জন্যও একটা ছোটখাট বোঝা বাঁধা হয়েছে। তা নিয়ে মা-বাবার সঙ্গী হবে ধানুয়াও। এখন মাঠে বাঁশ দিয়ে বাঁধা মাচার উপর বসে ধানুয়া আর তার মা অপেক্ষা করছে বাবার ফেরার জন্য। দূরে পাহাড়ি ঢালের পায়ে নদীর রেখার উপর শেষ রোদ পড়ে চিকচিক করছে। ধানুয়া তার মনে ঘুরপাক খাওয়া প্রশ্নটা করেই ফেলল, তুই আর বাবা জমি নিয়ে এত চিন্তা করিস কেন ?

মা তার দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয়ে হাসল, তারপর দূরে চোখ রেখে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, আমাদের টোটোদের অনেক জমি হারাতে হয়েছে। ধীরে ধীরে জমি-জঙ্গল থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে, আমাদের কষ্ট বাড়ছে। তোর বাবার কাছে শুনবি, একদিন আমাদেরও কত ধানী জমি ছিল নুবেতে, তোরসার পাড়ে। তোরসার কত মাছ তখন আমরা পেতাম। তোকেও তখন মাছ রান্না করে দিয়েছি। সেই জমি জাপেনরা সব দখল করে

নিল। হাতি চড়ে এসে জাপেনরা টোটোদের জমির ফসল, ঘর সব পুড়িয়ে দিল। সেই ১৯৬৮ সালে। তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল বিট অফিসার ভগবান দাশ। আমাদের টোটোপাড়ার মোড়লের কাছে ওই জমির উপর টোটোদের অধিকারের প্রমাণ তাম্রপত্রে লিখিত ছিল। সেসবকে সরকার কোনও মান দিল না। বলল ওসব তাম্রপত্র ইংরেজদের দেওয়া, এখনকার সরকার ওসব মানেনা। ধানুয়া, তোদের বড় হয়ে টোটোদের জমি-জায়গা ফিরিয়ে আনতে হবে, নইলে টোটোরা বাঁচবে কী করে...

জাপেন কাদের বলে ধানুয়া জানে। বাঙালি, বিহারী, নেপালি যারা টোটোপাড়ার বাইরে থেকে এসেছে, তাদের জাপেন বলে। বড়দের আলোচনা শুনে শুনে ধানুয়া অনেক কিছু জেনেছে। নেপাল থেকে জাপেনরা এসেছিল ভুটান থেকে কমলালেবু বয়ে আনার কাজ করতে। তারা আর নেপালে ফিরে না গিয়ে টোটোপাড়াতেই থেকে গেল, টোটোপাড়ার নানাদিকে ছড়িয়ে গেল। তারপর দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে কত বাঙালি এই অঞ্চলে এসেছে শরণার্থী হয়ে। সরকার তাদের সব দশ বিঘা করে জমি দিয়েছে। ধীরে ধীরে এখানকার আদি জনজাতিরাই সংখ্যায় কম হয়ে গেছে। টোটোদের জমি তখন বেদখল হতে লাগল। সরকার বলল যে তার সিলিং আইন অনুযায়ী টোটোরা তাদের অধিকারের সব জমি রাখতে পারবে না, অনেকটা ছেড়ে দিতে হবে। তারপর ভয় দেখাল যে বেশি জমি রাখলে অনেক টাকা খাজনা দিতে হবে আর তা না দিতে পারলে পুলিশে ধরে জেলে পুরবে। এভাবে টোটোরা খুব কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের বেশিরভাগ জমি খাস বলে চিহ্নিত হয়ে গেল সরকারি বাবুদের দ্বারা আর জাপেনদের হাতে সেসব জমির দখল যেতে লাগল। বাংলাদেশ থেকে আসা জাপেনরা তখন মাদারীহাটকে কেন্দ্র করে জুড়ে বসছে আর টোটোপাড়ায় নেপালি জাপেনদের জুড়ে বসতেও ইন্ধন দিচ্ছে তারা। দিদিমার সঙ্গে যখন প্রথম মাদারীহাট গিয়েছিল, তখন মাদারীহাটে বেশি ঘরবাড়ি দেখেনি। তারপর যখন পাঁচ ক্লাসে পড়তে মাদারীহাট গেল তখন ধানুয়া অবাক হয়ে গেল। রেললাইনের ধার দিয়ে কত নতুন নতুন ঘর বাংলাদেশ থেকে আসা জাপেনদের। তারা এখন লোকশক্তি বলে বলীয়ান। তারা ইউনিয়ন করেছে। তাদের হাকিম আছে, দারোগা আছে। আইন জানা আছে। আদালত– হাকিম– জমিদখল-কে তারা একসুতোয় বাঁধতে পারে। রতনে

রতন চেনে, শুয়োরে চেনে কচু। বাংলাদেশ থেকে আসা জাপেনরা লাল ঝাণ্ডা ধরে পার্টিগিরির আমদানি করল। নেপালি জাপেনরাও হল লালঝাণ্ডাধারী। জাপেনদের রোয়াব শক্তপোক্ত করার ঘাঁটি হিসাবে গজিয়ে উঠল সব পার্টি-অফিস। টোটোপাড়ায় টোটোদের কত জমি যে জোর করে দখল হয়ে আইনি-বেআইনি রকমারী পথে চলে গেল জাপেনদের কবজায়। টোটোদের গ্রামমণ্ডল, গ্রামপঞ্চায়েতের কোনও সিদ্ধান্তের তারা পরোয়াই করেনা। তারা কেবল তাদের নিজেদের স্থায়ী বসবাসের আর সমৃদ্ধিলাভের অধিকারের কথাই জানে, চীৎকার করে সভা-সমিতি-মিছিল থেকে তাই-ই ঘোষণা করে। তার জন্য টোটোদের জমি কেড়ে নিতে তাদের বাধে না। টোটোদের কাছে যা ছিল পবিত্র, সেই হাজার হাজার বছরের জঙ্গল ধ্বংস করে দিতে তাদের বাধে না। অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে হানাহানি কামড়াকামড়ি হিংসা আর আস্ফালনের অন্ধকার ডেকে আনে। সেই অন্ধকারে রাজা-মন্ত্রী-পেয়াদা সবই তারা কারণ নেতা-মন্ত্রী- এম এল এ- এম পি সর্বরূপে তারাই বিরাজমান। আর তারা বড়াই করে একেই বলে গণতন্ত্র।

ভোট আসে যায়। টোটোজাতির মানুষদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। জঙ্গল ও জমিকে ঘিরেই তাদের জীবন। জঙ্গল ও জমির ওপর অধিকার হারানো তাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে। টোটোপাড়ার তিন বয়স্ক মানুষ বীরেন টোটো, হরনা টোটো আর মাক্রা টোটো। তাঁরা আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করলেন যে নাবুর জমি উদ্ধার করার জন্য সরকারবাবুদের আদবকায়দা মেনে আলিপুরদুয়ারের আদালতে কেস করা হবে। তা উকিল পাওয়া যাবে কোথায় ? মেচজাতির একজন উকিল ঠিক করা হল। কেস উঠল আদালতে। মেচ উকিল বলল, এসব জমি ছিল টোটোদের ধানী জমি। আদালতের হাকিম বলল, প্রমাণ দাও। ব্রিটিশ আমলে সরকারের দেওয়া তাম্রপত্র তো স্বাধীনতার আমলের বিট অফিসার নিয়ে গায়েব করে দিয়েছে, এখন সেকথা অস্বীকারও করছে। আদালতের কাছে টোটোরা নিজেদের অধিকার প্রমাণ করবে কী করে ? টোটোদের হয়ে দঁড়ানো মেচ উকিল তপনবাবু তখন উত্তরবঙ্গে জনজাতিদের মধ্যে একমাত্র আইনের পরীক্ষা পাশ করা উকিল। মাদারীহাটের জাপেন রণী-ফনি বাবুরা তপনবাবুকে ধরে কষে হুমকি দিলেন। বলল যে টোটোদের হয়ে কোর্টে লড়লে মানুষ খেপে গিয়ে তাঁকে মারধোর করে বসবে, তাঁর প্রাণ নিয়ে

টানাটানি হবে, তখন তাঁকে কোনও নিরাপত্তা দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তপনবাবুও ভয় পেয়ে গেলেন, ভাবলেন, মন্ত্রী-সান্ত্রী-পুলিশ থেকে শুরু করে অস্ত্রশস্ত্র-হামলাবাজ অবধি সবকিছু যাদের নিয়ন্ত্রণে, তাদের চটিয়ে আপদ ডেকে এনে কী লাভ ? তাছাড়া রণী-ফনি বাবুরা তপনবাবুর আরো অন্য লাভেরও বন্দোবস্ত করেছিলেন। টোটোদের হয়ে কেস লড়া ছাড়ার পর রণী-ফনি বাবু ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের হরদম চলা সাজানো-বানানো কেস-খামারির কিছু কিছুতে তাঁকে উকিলগিরি করতে দিয়ে তাঁর মোটা আয়েরও বন্দোবস্ত হয়। আইনের দেবীর চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধা আর তার হাতে ধরানো দাঁড়িপাল্লা সবসময়েই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার ভারে একদিকে ঝুঁকে আছে। সেখানেই টোটোদের আইনি লড়াই লড়ে সুবিচার পাওয়ার আশা শেষ।

এরপর জাপেনরা আরো বেপরোয়া হল। মাদারীহাটের বাঙালি জাপেনদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে টোটোপাড়ার নেপালি জাপেনরাও লালঝাণ্ডা উড়িয়ে নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠার পার্টিবাজি তুঙ্গে নিয়ে গেল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টোটো জনজাতিদের অধিকারে থাকা একের পর এক জমি তারা দখল করে নিয়ে আইনি দখলিনামা তৈরি করে নিতে লাগল। দিদিমাদের আমলে টোটোজাতির চাষবাসের জন্য যা জমি ছিল, ধানুয়ার আমলে তাই এখন তার পাঁচভাগের একভাগ কোনওরকমে টিকে আছে।

ধানুয়ার মা বলে যে ধানুয়াকে এর প্রতিকারের পথ করতে হবে, জমি-জঙ্গলের উপর টোটোজাতির হারানো অধিকার ফিরিয়ে এনে টোটোজাতির কষ্ট দূর করতে হবে ? ধানুয়া ভাবে কীভাবে তা সম্ভব ? আইন-আদালত করতে গিয়ে তো টোটোরা জবর ঘা খেয়েছে। সে পথে তো কিছু হবার নয়। তাহলে পথ কী ?

ছয়
পুরোনো দিনের কথা

টোটোপাড়ায় রাতের অন্ধকার আর নৈঃশব্দ যখন এমন ঘন জমাট হয়ে ওঠে যে বাতাসও তা ঠেলে এগোতে বেগ পায়, আকাশ জুড়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মৃত পূর্বপুরুষদের চোখ, হিসপা আর পুদুয়া পাহাড় যেন একে অপরের দিকে ঝুঁকে পড়ে আলিঙ্গন করে, তখন মায়ের শরীরের ওমের মধ্যে গুটিয়ে শুয়ে ধানুয়ার ভালো লাগে মায়ের মুখে পুরানো দিনের গল্প শুনতে। অনেক অনেক পুরানো দিনের গল্প। শুনতে শুনতে ধানুয়া কল্পনা করে একশ বছর আগে এই পাহাড়-জঙ্গল-নদী আর তার জীব-জন্তু-মানুষেরা সব কেমন ভাবে বাঁচত। মা লক্ষিণী টোটোর কথা কালস্রোতে ভেসে যাওয়া সময়কে স্মৃতির আঁকশি দিয়ে টেনে আনত। ধানুয়ার মনে টুকরো টুকরো ছবির কারুকাজ গেঁথে বসত। ধানুয়া এখন তার মনের মধ্যে সেইসব কারুকাজের মধ্যে ঘুরছে।

বিশ শতকের প্রথম দিকে ধানুয়ার মা তখন খুব ছোট। টোটোপাড়া ভরা ছিল কমলালেবুর গাছে। শতরিং, জিদিং, ডুকরং এলাকায় ব্যাপকভাবে কমলালেবুর চাষ হত। গ্রামের মোড়ল ডঙ্গেং টোটোর কমলালেবুর বাগান ছিল বড়। এছাড়া ছিল গেন্দ্রা টোটো, লচু টোটোর। তখন কানাকড়ির— এক পয়সা, দুই পয়সা, তিন পয়সা, পাঁচ পয়সার— চল ছিল। ধানুয়ার বাবা আমেপা টোটো সারাদিন বাগান থেকে কমলালেবু বওয়ার কাজ করে বারো পন কমলালেবু বহন করে মজুরি পেয়েছিল বারো আনা পয়সা। এক পন মানে আশিটা, অর্থাৎ বারো পন মানে নশো ষাটটা। এই পয়সা দিয়ে কেনাকাটা করতে যেতে হত লঙ্কাপাড়া বাজারে। টোটোপাড়া থেকে ঘনঘোর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বারো কিলোমিটার পেরিয়ে লঙ্কাপাড়া পৌঁছতে হত।

একবার হল্লাপাড়া থেকে পঞ্চাশ পয়সায় কুড়ি কেজি ধান কিনে বয়ে আনতে গিয়ে রাস্তায় লক্ষিণীর শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বুকে দম নেই, পায়ে বল নেই, জঙ্গলের মাঝে নালার ধারে ধানের বোঝা ফেলে বসে পড়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন আর উঠতে পারবে না। আমেপা হঠাৎ কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছিল। তার বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল। তখনও লক্ষিণীর সঙ্গে আমেপার বিয়ে হয়নি।

কমলালেবু ভর্তি ঝুড়ি পিঠে করে লক্ষিণী টোটো কুয়াপানির জঙ্গলের রাস্তা ধরে যাচ্ছিল দলসিংপাড়ায় কমলালেবু বিক্রি করতে। কুয়াপানির জঙ্গলের ভিতর তখন এক বিশাল গণ্ডার দেখতে পেয়েছিল সে। ধানুয়া টোটো অবাক হয়েছিল তার বর্ণনা শুনে। সেই অদ্ভুত জন্তুর নাকের উপর খাড়া শিং। ধানুয়া জানত যে শিংওলা জন্তুদের মাথার উপর শিং গজায়, তাই অনেকক্ষণ ধরে সে মনে মনে এই অদ্ভুত জন্তুটার নাকের উপর শিংওলা মুখটা ঠিক কেমন হতে পারে ভাবার চেষ্টা করেছিল।

তখনকার দিনে টোটোপাড়ায় বাইরে থেকে আসা দোকানী বলতে ছিল কেবল লছমন যদু পাটোয়ারী। তার মুদির ব্যবসা, অস্থায়ী চৌকিতে মাল সাজিয়ে বসত। পয়সা বা কমলালেবুর বিনিময়ে বেচাকেনা চলত।

মাঝে মাঝে অবশ্য ফালাকাটা থেকে দুর্গম রাস্তা পেরিয়ে গোরুর গাড়ি করে কমলালেবু কিনতে আসত। তারা পয়সা, চিঁড়া বা সিঙ্গিমাছের বিনিময়ে কমলালেবু নিয়ে যেত।

তখন সোনার মুদ্রার প্রচলন ছিল, সে মুদ্রার নাম ছিল আসরফি। এক আসরফি মানে বিশ টাকা চাঁদির সমান।

সেসব দিনের অবসান হল যখন ধীরে ধীরে টোটোপাড়ার সব কমলালেবু গাছ মারা গেল।

কেন সব কমলালেবু গাছ মারা গেল ? ধানুয়ার এ প্রশ্নের উত্তরে মা শোনাত রাভা জাতির অভিশাপের কথা। রাভা জাতিরা টোটোপাড়ায় এসেছিল তাদের নাচ প্রদর্শন করতে। কিন্তু টোটো জনজাতির মানুষরা বহিরাগত মানুষদের হৈ-হল্লা-উচ্চস্বরে-কথা পছন্দ করত না, তাই তারা রাভা জাতির মানুষদের নাচগান করা থেকে বিরত করে। রাভা জাতির মানুষেরা তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল, অভিশাপ দিয়েছিল যে টোটোদের অহঙ্কারের মূল সব কমলালেবু গাছ ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই অভিশাপই ফলেছে।

ধানুয়া ভাবে যে ঈশ্বর সেংজা যখন রাভাদের অভিশাপ ফলতে দিয়েছেন, তখন টোটোরা নিশ্চয়ই কিছু অন্যায় করেছিল। রাভাদের সঙ্গে টোটোদের ব্যবহারের মধ্যেই কি সেই অন্যায় ছিল ? সে ব্যবহারের মধ্যেই কি ছিল ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার, যা সেংজা পছন্দ করেননা ? তাহলে আজকে যখন সব উন্নয়ন-এর ধ্বজাধারী জাতিরা ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কারে ভরা চোখে টোটোদের ছোট করে দেখে, তখন তাদের জন্যও সেংজা কি কোনও শাস্তির ব্যবস্থা করবেন ?

রাভা জাতির সঙ্গে টোটো জনজাতি অবশ্য সম্পর্কের নানা ধারায় বাঁধা। মা সেসবের কথা বলত। টোটোভাষায় বলে বিবরৌ পুজো। সে হল শিবের পুজো, বিশাল বটগাছের তলায় বাৎসরিক সে পুজো হত। এ পুজো করতেন রাভা পুরোহিত। ছেকামারি ও শিশুবারির মাঝের রাভাবস্তি থেকে বা হাসিমারা পার করে যে রাভাবস্তি সেখান থেকে বা আলিপুরের বঞ্চুকুমারী রাভাবস্তি থেকে রাভা পুরোহিত এসে সে পুজো করত। সাধারণত চৈত্র মাসের শেষে সে পুজো হত। এ ছিল শিবলিঙ্গের পুজো, এখানে মহিলাদের যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। রাভারা টোটোদের ভূমিপুজোর মন্ত্রপাঠও শিখিয়েছিল। মাটি, নদী, ঝোরা পুজোর মন্ত্র ও পায়রা পুজোর মন্ত্রও রাভাদের কাছ থেকেই টোটোরা শিখেছিল। বর্তমানেও টোটো জনজাতির মানুষরা তাদের নিজস্ব পুজো-পার্বণের পাশাপাশি এইসব মন্ত্রপাঠ করে পুজো করে থাকে।

দুই-একজন রাভা পুরোহিতের নামও লক্ষিণী টোটোর মনে আছে। মনিরাম রাভা, দুখন রাভা— এই রাভা পুরোহিতরা রাভাবস্তি থেকে টোটোদের সঙ্গে পায়ে হেঁটেই টোটোপাড়ায় আসত। পুজো-অর্চনা শেষ হলে টোটোরা আবার তাদের সঙ্গে করে রাভা গ্রামে পৌঁছে দিয়ে আসত।

টোটোপাড়া থেকে বাইরে যাতায়াতের পথেও টোটোরা রাভাবস্তিতে রাত কাটাত। তখন তোর্সা নদী দিয়ে নৌকাযোগে দলসিংপাড়া যাওয়া হত। দলসিংপাড়া থেকে পায়ে হেঁটে মেন্দাবারি মেচ গ্রামে পৌঁছে সেখানে রাত্রিযাপন। তারপর আবার পায়ে হাঁটা শুরু। আলিপুরদুয়ারের কাছের গ্রামের রাভাবস্তি বঞ্চুকুমারীতে রাত্রিযাপন। পরদিন আলিপুরদুয়ার শহরে প্রবেশ করে যে যার কাজ সারত। ফেরার পথও একইরকম। এখনও টোটো জনজাতির কাছে দুটো পিতলের কড়াই আছে সেসব দিনের নিদর্শন

হিসেবে। আইতুয়া টোটো ও হরকাসিং টোটো মারা গেছে কিছুদিন আগে। তাদের বাবারা তিনদিন ধরে পালা করে মাথায় বয়ে এই কড়াইদুটো টোটোপাড়ায় এনেছিল। টোটোসমাজে কারো বিয়ের সময় এই কড়াই এখনও ব্যবহার করা হয়। এক-একটা কড়াইয়ে একশ জনের খাওয়ার মতো মাংসের ঝোল রান্না করা যায়।

মেচ ও রাভাদের সঙ্গে টোটোদের এমনই নিবিড় সম্পর্ক ছিল। শীতকালে পায়ে হেঁটে একে অপরের গ্রামে যাতায়াত ছিল সাধারণ ব্যাপার। কেউ কেউ আবার সখা বা সখির সম্পর্কও পাতাত।

এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের মধ্যেও কী করে একজাতি অপর জাতিকে অপমান করে বসে আর সেই অপমানিত জাতি সর্বনাশা অভিশাপ দিয়ে বসে ? ধানুয়ার মনে এ প্রশ্ন ঘুরপাক খায়।

কমলালেবুর গাছ মড়কে শেষ হয়ে যাওয়ার পর টোটোরা বাঁশের চাষ শুরু করেছিল। ধানুয়া তার দিদিমার কাছে গল্প শুনেছে যে টোটোদের পূর্বপুরুষরা একসময় জঙ্গলে জংলি বাঁশের ঝাড়ের নিচে বসবাস করত। বাঁশ ছিল টোটোজাতির বন্ধু। রাতের বেলা শুকনো বাঁশ দিয়ে মশাল জ্বালিয়ে বন্য জন্তুদের দূরে রাখা, লম্বা শক্তপোক্ত বাঁশ ব্যবহার করে নদী-গিরিখাত পেরিয়ে যাওয়া, বাঁশের সিঁড়িতে চড়ে উঁচু উঁচু গাছে উঠে মধু সংগ্রহ— এসব তখন টোটোদের দৈনিক জীবনযাত্রার অঙ্গ ছিল। নানা ধরনের বাঁশের নানা নাম ছিল, যেমন— স্যাপা, দেংপা, অ্যাপা, বুরুপা। স্যাপা বাঁশ নরম ও ফাঁপা। এর কচি অংশ খাওয়া যায় আর এর কঞ্চি নরম ও ভালো হয়। বেড়া বাঁধতে, ঝুড়ি বুনতে এই বাঁশ ব্যবহার করা হত। স্যাপা-র তুলনায় শক্ত হয় যে বাঁশ তাকে বলত দেংপা, ঘর তৈরি এই দেংপা ছাড়া হবে না। লালচে রঙের আরেক ধরনের বাঁশকে বলত অ্যাপা, যা দিয়ে টোটোরা জলের পাত্র তৈরি করত। লালচে হলেও লম্বা গাঁটওয়ালা আরেক ধরনের বাঁশ হল বুরুপা। বাঁশের ঝাড় তখন জঙ্গলে আপনা থেকেই প্রচুর ফলত। ধানুয়ার জন্মের কিছুদিন আগে থেকে আশপাশের চা-বাগানের বিভিন্ন ফড়েরা বাঁশ কেনার জন্য টোটোপাড়া যাতায়াত করতে শুরু করে।

১৯৭৫ সাল। ধানুয়ার তখন বছর দশেক বয়স। কতবার সে বাঁশ-বোঝাই গরুর গাড়ির পিছনে ছুটতে ছুটতে হাউড়ি পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে। দমে যখন আর কুলোয়নি, তখন হাঁফাতে হাঁফাতে দাঁড়িয়ে দেখেছে

জঙ্গলের খাড়াই-উতরাই পথে সে গরুর গাড়ির কখনও ঢাকা পড়ে যাওয়া, কখনও আবার দৃশ্যমান হওয়া, এভাবে ক্রমশঃ ছোটো হতে হতে দূরে মিলিয়ে যাওয়া। টোটোপাড়ায় তখন কয়েকজনের গরুর গাড়ি ছিল, তারা হল— লাসে টোটো, গরবে টোটো, দিনেশ টোটো, গেচুং টোটো, গেরা টোটো। তারা গরুর গাড়ি বাঁশে বোঝাই করে সে বাঁশ আশপাশের চা-বাগানে সরবরাহ করত। লংকাপাড়া, গ্যারগাণ্ডা, ধুমচি, হান্টুপাড়া, তুলসিপাড়া— এমন নানা চাবাগিচার জন্য বাঁশের চাহিদা ছিল। শুধু বনের বাঁশ নয়, ব্যাপকভাবে বাঁশের চাষ শুরু হয়েছিল। আনাচে-কানাচে ঝোপেঝাড়ে বাঁশের গোড়া পুঁতে বাঁশ চাষ হত। সেই ১৯৭৫ সালেই ধানুয়া শুনেছিল যে একশটা বাঁশের দাম নব্বই টাকা, আর একশটা বাঁশ ঝাড় থেকে কেটে দেওয়ার মজুরি বাবদ আরো দশ টাকা।

টোটোপাড়ায় আসা-যাওয়ার দুর্গম জঙ্গলের রাস্তায় তখন দিনে বড়জোর সাত-আটজন হেঁটে আসত যেত। পাশের হল্লাপাড়া, এখন যার নাম হয়েছে বল্লালগুড়ি, সেখান থেকে মেচ জনজাতির দৈসিং কাজি আর ওরাওঁ জনজাতির জুলিস লাকড়া প্রায়ই টোটোপাড়ায় আসত, রাতে কখনও কখনও টোটোদের ঘরে থেকেও যেত। বল্লালগুড়িতে প্রচুর ধানের ফলন হত। প্রথমে কমলালেবু ও পরে বাঁশের বিনিময়ে ধানের আদানপ্রদান চলত। বল্লালগুড়ির কেউ কেউ ধানচাষের জন্য টোটোদের কাছ থেকে জোড়া বলদ নিত, বিনিময়ে গরুর মালিককে ১২ মণ ধান দিত। ধানুয়ার বাবার একজোড়া বলদ এভাবে চাষের কাজে খাটতে হল্লাপাড়া গিয়েছিল। ধান ঝাড়াই হয়ে গেলে বাবার সঙ্গে ধানুয়াও গিয়েছিল হল্লাপাড়ায়। গাড়িতে ধানবোঝাই করে জোড়া বলদ জুতে তারা ফিরেছিল টোটোপাড়ায়। কিন্তু তার আগে মেচ জনজাতির সেই বাবার বন্ধুর বাড়িতে দিনভর খাওয়া-দাওয়া গান-রসিকতার মধ্য দিয়ে ফসল তোলার উৎসবে সামিল হওয়ার অপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার।

১৯৮০-র দশকে হওয়া বাঁশের মড়কে টোটোপাড়ায় বাঁশ চাষ শেষ হয়ে গেল। কেবল চাষ-করা বাঁশ নয়, জঙ্গলের বাঁশও উজাড় হয়ে গেল। স্যাপা আর দেংপা তো বিলুপ্ত হয়ে গেল। অ্যাপা আর বুরুপা নামমাত্র কিছু টিকে রইল। সেই কমলালেবু উজাড় হয়ে যাওয়ার পর আবার কেন এমন ঘটল ? ধানুয়ার মনে খালি প্রশ্ন জাগে। ওর দিদিমা আর মা নিজেদের মধ্যে কিছু কথা বলাবলি করত, ধানুয়া শুনেছিল। সেসব কথাও মনে ফিরেফিরে আসে।

ধানুয়ার দিদিমা আর মা বলত যে সেংজা তাদের লোভের শাস্তি দিয়েছে। বাঁশকে জঙ্গলের মধ্যে জন্ম দিয়ে প্রকৃতিদেবতাই উপহার হিসেবে তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতিদেবতার দানে তুষ্ট না হয়ে কেনাবেচা আর লাভের লোভে যখন আরও বেশি বেশি বাঁশ ফলানোর জন্য তারা মরীয়া হয়ে উঠল, সেংজা-র তা ভালো লাগেনি।

ধানুয়া দেখেছে বাঁশ থেকে রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় টোটোপাড়ায় কীভাবে দিশাহারা ভাব তৈরি হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে সুপুরি চাষ ও সুপুরি বিক্রি শুরু হয়। টোটোপাড়া এখন সুপুরি গাছে ছেয়ে যাচ্ছে। তবে সুপুরি বিক্রির শুরু বহুদিন আগে ভুটিয়া গেটেচান-এর হাত ধরে। এই গেটেচান ভুটান থেকে এসে ব্যবসার সূত্রে অস্থায়ীভাবে টোটোপাড়ায় বসবাস শুরু করে। টোটোজাতির পঞ্চায়েত তখন আমেপা টোটো। ধানুয়া টোটো-র জন্ম হয়নি, তার বাবারই তখন কচি বয়স। আমেপা টোটো আর তার ভাইয়ের সঙ্গে গেটেচানের বন্ধুর মতো সম্পর্ক, খুব মেলামেশা। গোটা টোটোপাড়ার সুপুরি এক জায়গায় জড়ো করে ফৌজিদের ব্যবহৃত পুরোনো গাড়ি করে ফোন্টশেলিং-এর বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত আর ফেরার পর টোটোদের সুপুরির দাম দিয়ে দিত। তিরিশটা সুপুরির দাম মাত্র পঞ্চাশ পয়সা। পরে এই গেটেচান ভুটানে ফিরে গিয়ে ফোন্টশেলিং-এর মেয়র হয়েছিল। এখন মাদারিহাট থেকে সুপুরি কেনার ফড়েদের নিত্য যাতায়াত টোটোপাড়ায়।

সাত
প্রবাসে ধানুয়া

কোচবিহারের এক গঞ্জগ্রাম। নাম পঞ্চকন্যা। সেই গ্রামে মিশনারিদের চালোনো স্কুল আছে। আদিবাসী জনজাতির ছেলেরা সেখানে ছাত্রাবাসে থেকে পড়তে পারে নিখরচায়। ধানুয়া টোটো টোটোপাড়ার ইস্কুল থেকে চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর এখানে ভর্তি হয়েছে। মায়ের কাছে ধানুয়া শুনেছিল যে আগেকার দিনে দুই রাত্রি যাত্রা করে টোটোরা আলিপুরদুয়ার আসত। এই পঞ্চকন্যা সেই আলিপুরদুয়ারের থেকেও দূরে। অবশ্য এখন গাড়িতে যাতায়াত বলে অতটা সময় লাগে না। তবু, এখান থেকে ভোরভোর বেরলে টোটোপাড়া পৌঁছতে দিন শেষ হয়ে যায়।

ধানুয়ার বাবা যেদিন মিশনারিদের সঙ্গে কথা বলে কোচবিহারের স্কুলে ধানুয়ার ভর্তি হওয়া ঠিক করে এসেছিল, সেদিন ধানুয়ার মন আনন্দে উত্তেজনায় বর্ষার হাউড়ি হয়ে উঠেছিল। মাদারিহাটের ওপারের জগতে এই প্রথম তার পা পড়বে। জামাকাপড়ের পুঁটলি বেঁধে যেদিন বাবার সঙ্গে পা বাড়াল টোটোপাড়ার বাইরে সেদিনও মনে প্রবল আনন্দ-উত্তেজনা, তবে তার মধ্যেই বিষাদের ছোট ছোট চারা যেন মাথা তুলছিল মা ও দিদিমার গম্ভীর মুখ, ছলছল চোখ দেখে। টোটোপাড়া পেরিয়ে মাদারিহাট পেরিয়ে কিছুটা যাওয়ার পরই জঙ্গল-পাহাড় চোখে পড়ছিল না, চারদিকে কেবল চা-বাগিচার সমতল বিস্তার। ধানুয়ার তখন প্রথম খেয়াল হল যে কেবল চেনা মানুষজনদের ছেড়েই নয়, তাকে এখন থাকতে হবে তার চেনা জঙ্গল, গাছপালা, ঝোপঝাড়, শুঁড়িপথ, গুহা, নদী এসবকিছু ছেড়ে। মনের মধ্যে বিষাদ আরো ডালপালা ছড়াল। পঞ্চকন্যার ইস্কুলে পৌঁছে প্রধানশিক্ষকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ছাত্রাবাসে এসে ছাত্রদের থাকার ঘরে ধানুয়ার জন্য বরাদ্দ হওয়া খাটে ধানুয়ার জামাকাপড় গুছিয়ে দিয়ে তার বাবা বিদায় নিল।

ঘরে সার দেওয়া খাটগুলোর কয়েকটা ফাঁকা, বাকিগুলোয় ধানুয়ার বয়সী বা তার চেয়ে বড় সব ছেলেরা। তারা ধানুয়াকে ঘিরে দেখতে বা আলাপ করতে এল। ধানুয়া বাংলা ভাষা কাজ চালানোর মতো শিখে গেছে, তাই ওদের কথাবার্তা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও মানেটা মোটামুটি করে নিতে পারছিল, আর জবাবও দিতে পারছিল। কিন্তু টোটোভাষায় কিছু বলে ফেললেই এরা কিছু বুঝতে পারছিল না আর কয়েকজন তো অট্টহাসি হেসে উঠছিল ‘জংলি ভাষা’ মন্তব্য করে। ধানুয়ার ভিতরটা কুঁকড়ে গেল। সে বুঝল যে তার ভাষায় এখানে কথা বলা চলবে না। তার মনে হল তার জিভটাকে যেন কেউ দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলছে, অসহায় বোধ করতে লাগল সে।

ধানুয়ার কয়েকজন নতুন বন্ধু হয়েছে। বাংলা, সাদরি আর কামতাপুরী ভাষা সে রপ্ত করে নিয়েছে। সকালে উঠে সারিতে দাঁড়িয়ে প্রার্থনার পর শ্রেণিকক্ষে ঘন্টা চারেক লেখাপড়া। তারপর সারে বসে দুপুরের খাবার। এরপর এই বন্ধুদের সঙ্গে এদিক-ওদিক বেরিয়ে পড়া। ধানুয়ার সবচেয়ে ভালো লাগে কাছেপিঠের বড় বড় পুকুরগুলোয় মাছধরা দেখতে যেতে। টোটোপাড়ায় সে এমনটা কখনও দেখেনি। বড় পুকুরের ধারে মাছ ধরতে বসে কত লোক। মাছধরার কতো সাজসরঞ্জাম। কত রকমের ছিপ। বড় বড় প্রচুর ওজনের মাছকে জলে খেলিয়ে টেনে আনতে পারে এমন সব বিশেষ ধরনের ছিপ। আর আছে মাছ ধরার চার। পিঁপড়ের ডিম, কেঁচো আরও কতকী দিয়ে তৈরি। এই চার বানানো, ছিপ চালানো রীতিমতো দক্ষতার বিষয়। তা নিয়ে মাছ-ধরিয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও চলে। ধানুয়া মন দিয়ে দেখে, কলাকৌশল বোঝার চেষ্টা করে। দুই-একবার বন্ধুদের সাথে সাধারণ ছিপ নিয়ে মাছ ধরতেও বসেছে। এক বন্ধু মালো পরিবারের। সে তাকে নৌকা করে নদীর চওড়া বুকে মাছধরার নানা কলাকৌশল ও গল্পের কথা বলে। ধানুয়া অবাক হয়ে শোনে। নদীর এমন রূপ সে টোটোপাড়ায় দেখেনি, কল্পনায় তা দেখার চেষ্টা করে।

অন্য বন্ধুদের মুখে সে এই কোচবিহার দেশের পুরানো গল্পগাথা শুনতেও ভালোবাসে। তাদের মুখেই সে শুনেছে এই পঞ্চকন্যা গ্রামের নাম পঞ্চকন্যা হল কীভাবে তার গল্প। বহুদিন আগে গোসানিমারিতে ছিল কান্তেশ্বর রাজার দুর্গ। সেই দুর্গ আক্রমণ করে বাংলাদেশের নবাব হুসেন শাহ। হুসেন শাহ-র সেনা কান্তেশ্বর রাজার পাঁচ রাণীকে বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছিল। এই জায়গায়

এসে পাঁচজন রাণী কাতরস্বরে বলল, “আমাদের একটু বিশ্রাম দাও। আমরা তৃষ্ণার্ত। এই পুকুরের জল খেয়ে আমাদের তৃষ্ণা মেটাতে দাও।” নবাবের প্রহরীরা তাদের পুকুরের জল খাওয়ার অনুমতি দিল। পাঁচজন রাণী পুকুরের জলে নামল। কিন্তু সেই পুকুরের জলেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল, আর উঠে এল না। নবাবের প্রহরীরা বড় বড় জাল ফেলে গোটা পুকুর তল্লাশি করেও কোনও রাণীকে বা তাদের শব খুঁজে পেলনা। সেই অদ্ভুত ঘটনা থেকেই এই গ্রামের নাম হল পঞ্চকন্যা।

আজ শ্রেণিতে বাৎসরিক ফল ঘোষণা। নিরঞ্জন মাস্টার ফলের তালিকা নিয়ে শ্রেণির ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে আজ এসেছেন প্রধানশিক্ষক মশায়। ছেলেরা আজ একটু গুটিসুটি হয়ে বসে আছে তাদের বেঞ্চে। প্রধানশিক্ষক মশায় চেয়ারে বসলেন। নিরঞ্জন মাস্টার একএকজন ছেলেকে ধরে তার পরীক্ষার ফল ও সাধারণ অগ্রগতি নিয়ে বলতে শুরু করলেন। যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে সেই ছাত্রকে তখন তার বসার জায়গায় উঠে দাঁড়াতে হবে। চারজনের পরে এল ধানুয়ার পালা। নিরঞ্জন মাস্টার ধানুয়ার নাম ঘোষণা করতেই ধানুয়া উঠে দাঁড়াল। মাটির দিকে তার চোখ নামানো। নিরঞ্জন মাস্টার তখন প্রধানশিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বলছে, “কী বলব মাস্টারমশাই, এই ধানুয়াকে পড়তে বসানো দুষ্কর। বিকেল হলেই মারবেল খেলা আর রবিবার হলে মাছ-কাঁকড়া ধরতে যাওয়া আর নয়তো বাঁটুল হাতে পাখি মারতে যাওয়া। তবে প্রত্যেকবার পরীক্ষার ফলে এই চতুর্থ বা পঞ্চম স্থান পায়। পড়াশোনায় মন বসলে এই মাঝারিমানের ফলের থেকে আরো ভালো করতে পারে বলে আমার মনে হয়।” এরপর নিরঞ্জন মাস্টার বিভিন্ন বিষয়ে ধানুয়ার নম্বর ঘোষণা করলেন। তারপর পরবর্তী ছাত্রের নাম ঘোষণা করল। ধানুয়া হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। গুটিসুটি হয়ে আবার নিজের বসার জায়গায় বসে পড়ল। সবার ফল ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর প্রধানশিক্ষক মশায় ভাষণ দিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে তাদের আরো বেশি নম্বর তোলার জন্য নানা পরামর্শ দিলেন। বাকিদের বললেন তাদের অনুসরণ করার জন্য। আর যে ছয়জন ফেল করেছিল তাদের সাবধান করে দিলেন যে পরেরবার ফেল করলে এই ইস্কুল থেকে বের করে দেওয়া হবে। ভাষণশেষে তিনি ও নিরঞ্জন মাস্টার বেরিয়ে গেলেন।

সফলদের উচ্ছ্বাস, অসফলদের ভারাক্রান্ত আশঙ্কিত মন। ধানুয়ার শুধু স্বস্তি যে আরেকটা ক্লাস পাশ দিয়ে টোটোপাড়ায় ফেরার দিনটা আগিয়ে আনা গেছে।

পঞ্চকন্যার মিশনারি স্কুলেরও সব ক্লাস পাশ দেওয়া হয়ে গেল ধানুয়ার। স্কুলের শিক্ষকরা তাকে ফালাকাটায় গিয়ে ফৌজের চাকরিতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করতে বলল, সে ব্যাপারে তাকে নানা সাহায্য করারও কথা বলল। কিন্তু ধানুয়া আর কোথাও যেতে চায়না। সে শুধু টোটোপাড়ার পাহাড়, গুহা, জঙ্গল, নদীতে ফিরে আসতে চায়, আপনজনেদের সঙ্গে টোটোভাষায় কথা বলতে চায়। এসব ছাড়া যে তার জীবনের বড় অংশ শূন্য হয়ে যায়। শত সুযোগসুবিধাও সে শূন্যতা ভরাট করতে পারেনা। চার বছর প্রবাসের পর ধানুয়া আবার মায়ের মতো কোল পেতে রাখা টোটোপাড়ায় ফিরে এল।

আট

চম্পাকলির প্রবেশ

এই চার বছরে টোটোপাড়ায় অনেক বদল ঘটে গেছে। টোটোদের পরম্পরাগত গ্রামসভা বা গ্রামপঞ্চায়েতের এখন আর কোনও ক্ষমতা নেই। সরকার যে পঞ্চায়েত বসিয়েছে, সব ক্ষমতা এখন তারই। ভোটের কারসাজিতে পোক্ত জাপেনরাই সেই পঞ্চায়েতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাদের লেজুড় হয়েছে টোটোপাড়ারও সুবিধাসন্ধানী কয়েকজন। গ্রামের সরকারি স্কুলের মাস্টার ও সরকারি শাসক দলের নেতা হরেকৃষ্ণবাবুর কথায় এখন সব চলে। ধানুয়ার বাবার মতো বয়স্ক অভিজ্ঞ টোটোদের এইসব নয়া শাসনকর্তারা কোনও সম্মানই করেনা।

ধানুয়ার দিদিমাও মারা গেছে। বাড়ি লাগোয়া বাগানে তার কবর। বয়সের খাঁজে ভর্তি মুখে উজ্জ্বল তারার দুটি চোখ আর চকিত হাসির ঝলক আর চোখের সামনে দেখা যাবেনা, কেবল চোখের পিছনে মনের গভীরে ফিরে ফিরে দেখতে হবে। দিদিমা তার আদরের ধানুয়ার জন্য উঠোনধারে লামপাতির গাছ বসিয়ে গিয়েছিল। সে গাছ ডালপালা মেলে মাথাচাড়া দিয়েছে। দিদিমার ভালোবাসা যেন ধানুয়ার সামনে এই গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দিদিমার সঙ্গে যাওয়া ডয়ামারা গুহায় গিয়ে বসে থাকে ধানুয়া। ধ্যানমগ্ন জঙ্গল-নদী-গুহার মাঝে চোখ বুজে দিদিমার সান্নিধ্য অনুভব করে। এমনই এক দিনে তার জীবনে নতুন মানুষ প্রবেশ করল। ডয়ামারা গুহার গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিল ধানুয়া। হঠাৎ তার কানে এল মধুর কণ্ঠে পাখিদের ডাকের সাথে গলা মিলিয়ে কে যেন গান গাইছে। চোখ মেলে দেখল একটা মেয়েকে। বয়স তারই মতো। নিচে নদীর ধারে পাথরের উপর

বসে আপন মনে গান গাইছে, পা দিয়ে জল ছিটোচ্ছে। ধানুয়া স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, নিজের উপস্থিতি জানান দিল না। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল মেয়েটির মুখে কত আবেগের মেঘ ঘনায়, আবার বিজুলিরেখার মতো হাসি ঝিকিয়ে ওঠে, মাথার লম্বা চুল রহস্যের পর্দা দোলায়, দেহ যেন ভরা হাউড়ির ঢেউয়ের মতো দোলে। ধানুয়া যেন জাদুতে বাঁধা পড়ল। খানিক্ষণ পর মেয়েটি নদীখাত থেকে উঠে উল্টোদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে চলল। ধানুয়াও দূরে দূরে থেকে তার পিছু নিল। পাহাড়-গা বেয়ে উঠে ঢাল যেখানে কিছুটা সমতল হয়েছে, দুটো গরু ঘাস-পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিল। ভেঙে পড়া শুকনো ডালের একটা ছোট বোঝাও পড়ে ছিল। মেয়েটি সেই বোঝা মাথায় তুলে গরু দুটোর পিঠে চাপড় দিয়ে জঙ্গলের মধ্যের পথ দিয়ে হাঁটা লাগাল। গরুদুটোও তার সামনে সামনে এগিয়ে চলল। কিছুটা দূরত্বে আড়াল বজায় রেখে পিছু পিছু চলল ধানুয়াও। মেয়েটি তাহলে গরু চরাতে আর কাঠ কুড়াতে এসেছিল। টোটোপাড়ারই মেয়ে নিশ্চয়। ধানুয়ার বারবার ইচ্ছে হচ্ছিল এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার মাথার বোঝাটা নিজে বয়ে দেয়, কিন্তু অদ্ভুত এক জড়তা তাকে আটকে রেখেছিল। মেয়েটা যদি খারাপ কিছু ভাবে, মেয়েটা যদি রেগে যায়! লঙ্কাপাড়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হাউড়ি পেরোনোর আগে মেয়েটা আবার গাছের তলায় জিরোতে বসল। গরুদুটোও এদিক ওদিক ঘুরে আবার ঘাস খেতে লাগল। সূর্যের তেরছা আলো এখন মেয়েটার মুখে এসে পড়েছে। জঙ্গলের কিনার ছেড়ে ধানুয়া বেরোতেই মেয়েটা একগাল হেসে ধানুয়ার দিকে ফিরে বলল, কাঠও কুড়ালে না, কন্দ-শাকও তুললে না, জঙ্গলে ঘুরে করছটা কী? ধানুয়া বুঝতে পারল মেয়েটা অনেকক্ষণই তাকে টের পেয়েছে। কী উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে মনের কথাটাই বলে ফেলল, কী সুন্দর গান গাইছিলি তুই। মেয়েটির হাসি ঝর্ণাধারায় উছলে ওঠে, বলে, ও তুই গান শুনতে জঙ্গলে এসেছিলি! ধানুয়া বলে, না, আজতো গান শুনতে না এসেই গান শুনতে পেলাম, তবে এবার থেকে জেনে শুনেই গান শুনতে আসব। মেয়েটার হাসির ঝর্ণার জল সব জড়তাকে ধুয়ে নিয়ে যায়। ধানুয়া মেয়েটার পাশে বসে। তার মনে হয় যেন গোটা পৃথিবীটা মুছে গেছে, কেবল হাউড়ির ধারের এই গাছের তলাটা সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠে তাদের দুটো মানুষকে ঘিরে রেখেছে। কথায় কথায় জানা যায় মেয়েটার বাড়ি টোটোপাড়ার মিত্রং গ্রামে। নাম চম্পাকলি টোটো।

এরপর প্রায় প্রতিদিনই পাহাড়ে, জঙ্গলে, ঝোরার ধারে, নদীর ধারে ধানুয়া আর চম্পাকলি দেখা করে কাজের ফাঁকে, আবার অকাজের ফাঁকেও। ধানুয়ার বাবা-মার চোখে পড়ে। বাবা-মা আলোচনা করে ধানুয়ার বিয়ের সময় এবার হয়ে গেল। চম্পাকলির পরিবারের সঙ্গেও কথাবার্তা হয়। টোটোদের পরম্পরাগত প্রথা অনুযায়ী ধানুয়া আর চম্পাকলির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

বিয়েটা তাদের বেশ অল্প বয়সেই হল। উভয়কে বাবা-মা সংসার নামক জগতে প্রবেশ করিয়ে দিল। ধুমধাম করে দুইদিন বিয়ের বাড়িতে সানাই-ঢোল-মাদল বাজিয়ে, গ্রামের লোকদের পেট-ভরতি খাইয়ে আনন্দ করল।

বছর না ঘুরতেই চম্পাকলি গর্ভবতী হল। বাবা-মা বলল এবার তো তোদের নিজেদের আলাদা পরিবার করতে হবে। গ্রামে কোনও কাজকর্ম নেই, কীভাবে নতুন সংসার পাতবে ধানুয়া ভেবে পায়না। এতকাল তো বাবা-মা-র ঘরে খাওয়া দাওয়া করেই অভ্যাস। সংসার আলাদা হওয়ার আগেই বাবা মারা গেল। মা বলল, ধানুয়া এবার তোরা আলাদা সংসার কর। ধানুয়ার আর কোনও উপায় রইল না। এতদিনের ঘর ছেড়ে নতুন ঘর বানিয়ে চম্পাকলিকে নিয়ে সেখানে গিয়ে উঠল।

বছর ঘুরতেই চম্পাকলির ঘরে ফুটফুটে শিশু জন্মাল। চম্পাকলির বুকে আনন্দের ঢেউ। তার আশা এই খুদে মানুষটা একদিন বড় হয়ে তাদের বৃদ্ধ বয়সে লালন পালন করবে। মৃত দাদুর নামে ছেলের নাম রেখেছিল দাদুয়া।

নয়
সরকারি পঞ্চায়েতবাবুদের গুস্‌সা

ধানুয়ার ঘর ভরে উঠল আনন্দে কিন্তু অভাব-অনটন আরও ঘাড়ে চেপে বসল। কাজের সুযোগ নেই। ধানুয়ার প্রচণ্ড জেদই এর কারণ। কোনও কথায় কারও কাছে সে নত হতে চায়না। রাজনৈতিক নেতা হরেকৃষ্ণ তাকে বাগে আনতে পারে নি। উল্টে পেন্বা টোটো হরেকৃষ্ণর কাছে নালিশ করেছে যে ধানুয়া হরেকৃষ্ণ ও তার শাগরেদদের দেখে নেবে বলেছে। পেন্বার নালিশ শুনে হরেকৃষ্ণ মাদারীহাটে পার্টিঅফিসে তড়িঘড়ি মিটিং ডেকেছে।

সভায় সবাই হম্বিতম্বি করল: এত বড় কথা! স্কুল ফেরতা হয়েই টোটোপাড়ায় মস্তানির আখড়া খোলা! টোটোপাড়ায় তাদের দলের হাতেই সব ক্ষমতা। এখন এই এঁড়ে বাছুর আবার পাল্টা দল পাকাতে চায় নাকি! পার্টির লোকেরা সব গম্ভীর মুখে আলাপ আলোচনা করে।

হরেকৃষ্ণবাবুকে বলে, বলুন মাস্টারমশাই কী ব্যবস্থা করা যায়— এঁড়ে বাছুর গুঁতোতে এলে তার সদ্য গজানো শিঙটাকেই তো ভেঙে দিতে হয়।

হরেকৃষ্ণবাবু প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলেন, অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ও সবে স্কুল থেকে ফিরেছে। মাটি থেকে পা উঠে গেছে। নিজে থেকেই আবার মাটিতে পা ফিরে আসবে। গ্রামের লোকজনদের নিয়ে ও কোনও দল পাকাতে পারবে না। রাজ্যের সরকার আমাদের পার্টির দখলে। থানা-বিডিও-পঞ্চায়েত অফিস সব আমাদের হাতে। জি-আর-য়ের গম, চাল টোটোপাড়ায় আমাদের হাতে বাছা লোকরাই তো পাবে, নাকি ? গম-চাল-পাওনাগণ্ডা খুইয়ে কে এমন বোকা আছে যে ঢাল-তরোয়াল-হীন নিধিরাম সর্দার ধানুয়ার দলে যোগ দেবে ? ধানুয়া তাদের কী দিতে পারবে ?

নেতার মুখে হাসি দেখে শাগরেদদের ঠোঁটেও হাসির মুদ্রা ফুটে উঠছিল। এখন তা রীতিমতো সশব্দ হাসির ফোয়ারায় ছিটকে বেরোল। নেতা হরেকৃষ্ণবাবুও অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন।

মিটিং শেষে হরেকৃষ্ণ মাস্টারের বাড়ির বারান্দায় পাত পেড়ে বসে সবাই মুরগির মাংসের ঝোলে মেখে ভাত গিলল, মাংস চিবাল, হাড় চিবাল। তারপর ছোট আর মেজ মাতব্বররা বিদায় নিল। বড় মাতব্বর কয়েকজন রয়ে গেল মাস্টার নেতার সাথে আরও কিছু জরুরী কথা সেরে নেওয়ার জন্য।

বড় মাতব্বরদের নিয়ে মাস্টার আবার তার বৈঠকখানায় ফিরে এল। গ্লাস এল। ভুটানি রামের বোতল বের হল। বৈঠকখানার দরজা ভিজিয়ে গলা ভিজানো শুরু হল। সঙ্গে শুরু হল বড় মাতব্বরদের আলোচনা।

হরেকৃষ্ণবাবু সবার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আলতো করে সবার মাঝে প্রশ্নটাকে ছেড়ে দিলেন: ধানুয়া লোকজনদের কী বলছে ?

মঙ্গরপাড়ার কাজি তামাঙ মুখ ভেঙচে বলে উঠল: বেজন্মাটা লোক খেপাচ্ছে। টোটোপাড়ার সব জমি, তোরসার কোল থেকে ভুটান পাহাড় অবধি নাকি সব টোটোদের ছিল। এখন সব সরকার আর জাপেনরা মিলে দখল করে নেওয়াতেই নাকি টোটোদের অভাব-অনটনে পড়তে হয়েছে। ও শালা টোটোদের সঙ্গে নেপালিদের মারদাঙ্গা বাঁধিয়ে ছাড়বে মনে হচ্ছে।

পেম্বা টোটো কাজির কথা ধরে বলে: পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ধানুয়া লোক জড়ো করে সভা করছে। সেদিন দেমসার সভাতেও ও সবার সামনে একই কথা বলল। ও বলছে টোটোপাড়ার মাটি টোটোদের ঠাকুরদা ঠাকুরমা বাপ দাদাদের হাতে তৈরি, এ মাটিতে আমাদের পূর্বপুরুষদের হাড় মিশে আছে, এ মাটি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আমরা বাঁচতে পারব না, তাই অন্যদের হাতে আমাদের জমি দখল হয়ে যাওয়া রুখতে হবে।

গেদু টোটো বলে: টোটোপাড়ার স্কুলের মাস্টাররা কেন টোটো ভাষা শিখে নিয়ে টোটো বাচ্চাদের সে ভাষায় পড়ায় না ? টোটো বাচ্চারা সেজন্যই বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারেনা। ধানুয়া এও বলে।

হরেকৃষ্ণবাবু তাঁর রামের গ্লাস আবার ভরে নেন। বোতলটা বাকিদের বাড়িয়ে দেন। হেলান দিয়ে বসে আয়েস করে চুমুক দেন। মেজাজে চোখ আধবোজা হয়ে আসে। তাঁর পার্টির বড় মাতব্বরদের কথাগুলো নিয়ে যেন মনে মনে নাড়াচাড়া করেন। তারপর বেশ ধীরেসুস্থে বলতে শুরু করেন:

ছেলেটা একরোখা, তবে জোশ আছে। শিঙ ভেঙে যদি আমাদের পার্টিতে ঢুকিয়ে নেওয়া যায়, তবে কাজে দেবে। ওর সঙ্গে নরমে গরমে খেলতে হবে। তোমরা ওর সঙ্গে কথা চালিয়ে যা দরকার হয় ব্যবস্থা করে ওকে পার্টিমেম্বার করার চেষ্টা কর। আমি অন্যদিকটা দেখছি। তোমরা তো বলেছিলে বিশুয়া, হারু আর নচুয়া টোটো ওর স্যাঙাত হয়েছে। গতকাল রাতে ওদের পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে জানো তো। মাদারীহাট থানায় গিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলে আমিই এফ-আই-আর করে এসেছিলাম। রগচটা মাতাল তিনটে ছেলে টোটোপাড়ায় টোটো-নেপালি দাঙ্গা বাঁধাচ্ছে বলে বড়বাবুকে বলে এসেছিলাম যে ওদের তুলে এনে যেন কিছুটা সবক শিখিয়ে ছাড়া হয়। ধানুয়ার কথা বলিনি কারণ বললামই ওকে আমাদের পার্টিতে টানতে হবে। বড়বাবু ছোঁড়া তিনটেকে গারদে পুরেছে, কিছু দলাইমলাই করে সময়মতো ছেড়ে দেবে। ওদের হাল দেখে বাকিরা শিখবে। ধানুয়ার দলে আর কেউ ভিড়বে না।

ধানুয়াকে দলে টানার জন্য লোক লাগল। চাকরির লোভ দেখাল। কিন্তু ধানুয়া কিছুতেই রাজি হলনা। সে বলল, ভুখা পেটে থাকব, কিন্তু কারও গোলামি করব না।

গেদু টোটো হতাশ হয়ে হরেকৃষ্ণ মাস্টারকে গিয়ে বলল:
না গো, পারলাম না মাস্টার। ও বড় জেদি ছেলে গো। কিছুতেই মানল না। ঘরে দেখলাম ভুখা আছে। তবু বলে টোটোদের জন্য মরতে হলে মরবে, জাপেন নেতাদের কাছে নিজেকে বিকোবে না। ওর সঙ্গে ভালোকথা বলতে গেলে নিজেদেরই মানসম্মান খোয়াতে হয়, আমরা বাপু ওর সঙ্গে আর দলে আসার কথা বলতে পারব না।

হরেকৃষ্ণ বলে:
ঠিক আছে, কিছুদিন ভুখায় শুকাতে দাও, মাথা ঠান্ডা হবে। কতগুলো বাউণ্ডুলে টোটো ছোঁড়াকে নিয়ে ও আমাদের গায়ে আঁচড়টিও কাটতে পারবে না। আমাদের দলে টোটো আছে, জাপেনও আছে। পার্টি আছে, সরকার আছে। ধানুয়া ভাবছে যে এখনও ওর বাপ-ঠাকুরদার জংলি রাজত্ব বজায় আছে। কথায় না শুধোলে ধাক্কা খেয়ে শুধোতে দাও।

দশ

খরার দহন

প্রচণ্ড খরা দেখা দিল সে বছর। টোটোদের গ্রামে গ্রামে হাহাকার উঠল। টোটোপাড়ার জঙ্গল আর পুদুয়া পাহাড় থেকে জংলি কন্দ আর শাক সংগ্রহ করে কোনওমতে প্রাণটুকু ধরে রাখার চেষ্টা। সরকার থেকে সপ্তাহে ১০ কেজি গম দেয়। তাও সব পরিবার পায়না। পার্টিবাবুদের ধরাকরা করেও গম পাওয়ার তালিকায় সবার নাম ওঠে না। সরকার থেকে আর কোনও সাহায্যও আসেনা।

ধানুয়ার ঘরের সামনে দিয়েই রোজ সকালে টোটোজাতির মানুষ দলে দলে পুদুয়া পাহাড়ের দিকে যায় ঝুড়ি পিঠে বেঁধে। বিকেল গড়িয়ে আঁধার নামার মুখে কন্দ-আলু-শাক-পাতা বোঝাই ঝুড়ি পিঠে ক্লান্ত দেহগুলো ফিরে আসে। নৈমিত্তিক এ মিছিলে কোনও কোনওদিন ধানুয়া আর চম্পাকলিও যোগ দেয়। ধানুয়ার মা-র ঘরের উঠোনে মাঝেমধ্যে জঙ্গল-ফিরতি কিছু মানুষ এসে বসে। দু দণ্ড জিরিয়ে নেয়। কিছু কথা চালাচালি হয়। ভুট্টাভাজা ও লাল চা-র আয়োজন করে ধানুয়ার মা। কেউ কেউ কিছু কন্দ আর আলু ধানুয়ার বৃদ্ধ মা-র জন্য রেখে যায়।

এমন সময়েই মিশনারিরা হাসপাতাল আর স্কুল তৈরি করল। ডিসেম্বর মাসে তাদের প্রভু যিশুর জন্মদিনে চারদিকে নানারঙের আলোর বন্যা বইয়ে দিল। কোনসব বিদেশি কুবেরের ভাণ্ডার থেকে তাদের টাকা আসে। খরার ছায়ায় মলিন গ্রামে তারা আলোর রোশনাই লাগায়। সব ব্যবস্থা করার জন্য সাহেবসুবোরা আসে। তাদের জন্য খাদ্য-পানীয়ের অঢেল মজুদ আসে সঙ্গে। কিছু টোটো যুবক-যুবতীদের বেছে নিয়ে তারা কোচবিহারে পাঠায় কর্ম-প্রশিক্ষণের জন্য। কাঠমিস্ত্রির কাজ, তাঁতের যন্ত্র চালানোর কাজ, উচ্চফলনশীল চাষের কাজের প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে আসে তারা। মিশনারিরা টোটোপাড়ায় তাঁত হস্তশিল্প কারখানা চালু করল। সামান্য মাসিক ভাতার

বিনিময়ে টোটো তাঁতশিল্পীরা কাপড় বুনতে লাগল। মিশনারিরা সেগুলো সব বাইরে কোথায় কোথায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। কিন্তু বছর ঘুরতেই সেই তাঁত কারখানার ঝাঁপ বন্ধ হল। মিশনারিরা কী জানি কেন আর তা চালাল না। টোটো যুবক-যুবতীরা এবার কাজের খোঁজে ভুটান পাড়ি দিতে শুরু করল। কমলা লেবুর বাগানের কাজ, জঙ্গল কেটে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরির কাজ, বিদ্যুতের খুঁটি আর লাইন টানার কাজ। অনাদরে অবহেলায় তাদের কতজন মারা গেল দুর্ঘটনায়— বরফজমা শীতে জমে, পাহাড়ের ধ্বসে চাপা পড়ে বা বিদ্যুতের ভয়ঙ্কর ছোবলে। তবু বাকিরা ফিরে এল নগদ কিছু টাকা হাতে নিয়ে। তাই ভুটানে কাজের খোঁজ চলতে থাকল।

অভাব নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে উঠল। কাউকে তোষামোদ না করায় সরকারি পঞ্চায়েতের কোনও কাজ ধানুয়া পেল না। ভাইয়ের সঙ্গে ভুটানের হিসপা পাহাড়ে রিঠা বা দারচিনি সংগ্রহ করতে যায় ধানুয়া। ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করে অভাবের দাপটের সঙ্গে লড়তে হয়। ভুটানের হিসপা পাহাড়ের জংলি ফসল সংগ্রহ করে কোনওরকমে দিন চলে। খিদে চারদিক থেকে হাঁ করে গিলতে আসে। তবু ধানুয়ার স্থির প্রত্যয় যে একদিন তার স্বপ্ন সফল হবে, টোটোজাতি তাদের মাতৃভূমি ফিরে পাবে, জমি ও জঙ্গলের আশীর্বাদে সবার জীবন আবার ভরে উঠবে। সমবয়সীদের সে বোঝায় যে সরকারের কাছে হাত পেতে জীবন ভরবে না, টোটোদের জীবনের শিকড় জমি আর জঙ্গলের মধ্যে গাঁথা আছে, সে শিকড় উপড়ে গেলে টোটোদের জীবনও শুকিয়ে যাবে। বর্গাদার জাপেন জাতিরা সরকারি কলকবজা খাটিয়ে টোটোদের জমি-জায়গা দখল করে বসেছে, সরকার আইন করে বন্দুকওলা পাহারাদার বসিয়ে একের পর এক জঙ্গলে টোটোদের ঢোকা নিষেধ করে দিচ্ছে, এসব হতে দেওয়া চলবে না। জমি আর জঙ্গলের উপর টোটোদের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে। নাহলে আগামী প্রজন্মের জন্য তারা কেবল দাসত্ববৃত্তিই রেখে যাবে।

নেতাদের তৈরি করা তালিকা ধরে টোটোপাড়ায় সরকারি পঞ্চায়েতের গম ও আর্থিক সাহায্য আসে। সে তালিকায় ধানুয়ার নাম নেই। চম্পাকলি ধানুয়াকে বারবার বলে মাদারীর পার্টি অফিসে গিয়ে তালিকায় নামটা তুলে আসলে ক্ষতি কী ? ধানুয়ার যেতে মন সায় দেয় না। তবু চম্পাকলি আর বাচ্চাগুলোর অর্ধাহার-অনাহারে শুকিয়ে আসা সহ্যও করতে পারে না। একদিন গিয়ে হাজিরই হয় মাদারীর পার্টি অফিসে। হরেকৃষ্ণবাবু তাঁর সঙ্গে

কোনও কথাই বলেন না। কাগজপত্র নিয়ে টেবিলে বসে থাকা এক মেজোনেতার দিকে তাকিয়ে বলেন, তপন, তোমার হাতের কাজটা সারা হলে একটু শুনে নিয়ো তো এই ছোকরা কী বলতে চায়। তপনবাবু একবার চোখ তুলে চেয়ে কোনও কথা না বলে আবার কাগজপত্রে চোখ নামিয়ে হাতের কাজ সারতে থাকেন। ধানুয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বারবার সে নিজেকে গালি দিতে থাকে, কেন সে মাথা নুইয়ে এদের কাছে এল। আত্মগ্লানিতে অসহায় বোধ করে।

ঘন্টাখানেক পর তপনবাবু জনা সাতেকের সঙ্গে নানা কথা সারার পর, এক গ্লাস চা ও তিনটে ফিল্টার সিগারেট সেবন করার পর, আড়মোড়া ভেঙে নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে ধানুয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন:
ও তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস। টোটোপাড়ায় তো শুনি গর্বে তোর পা মাটিতে পড়ে না। তা এখানে তো বেশ মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছিস। তা বল কী ব্যাপার।

ধানুয়ার ইচ্ছে হয় একটাও কথা না বলে তখনই সে বেরিয়ে যায়, কিন্তু চম্পাকলি আর বাচ্চাদের মুখগুলো ভেসে ওঠে, সে দুর্বল হয়ে পড়ে। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বলে, পঞ্চায়েতের সাহায্যের তালিকায় আমার নাম ওঠেনি, যদি নামটা তুলে...।

কথাগুলো যেন ধানুয়ার গোটা বুকটাকে আর স্বরনালিকে দগ্ধ করতে করতে বের হচ্ছিল। কিন্তু তার কথা শেষ হতে পারলনা। তপনবাবুর অট্টহাসির বিস্ফোরণ হল। বাকি কথা ধানুয়ার গলার মধ্যেই আটকে রইল। উচ্চগ্রাম থেকে নিম্নগ্রামে পর্যায়ক্রমিক অবরোহণের পর অট্টহাসির ধকল সামলাতে সামলাতে তপনবাবু বললেন:
আরে ওটা তো গরিবগুর্বো সর্বহারাদের তালিকা, সাহায্য তো তাদের জন্য। তুই তো রাজার বংশের ছেলে, টোটোপাড়ার সব জমি জঙ্গলের মালিকানাসত্ব তোদের হাতে। যা, ওই মালিকানাস্বত্ব নিয়ে কোর্ট-কাছারিতে যা, সম্পত্তি উদ্ধার কর। পঞ্চায়েতের ভিখ-মাঙাদের তালিকায় নাম তুলতে এসেছিস কেন ? গাছেরও খাবি আবার তলারও কুড়োবি ? তোদের মতো সুবিধাবাদীদের জন্যই টোটোপাড়ার এই দুর্দশা।

ধানুয়ার মনে হয় যেন সে আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, আত্মধিক্কারের আগুন, কেন সে এদের কাছে সাহায্য চাইতে এল। খুক খুক করে হাসতে

হাসতে তপনবাবু বেরিয়ে গেল। ধানুয়া যেন নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়েছে। পার্টিঅফিসের ঝাড়ুদার এসে তাকে তাড়া লাগায়:

আহাম্মকের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন শালা, ভাগ এখান থেকে। ঝাড়পোঁছ করে আমায় এখন অফিসে তালা দিতে হবে।

ধানুয়া চলৎশক্তি ফিরে পায়। মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসে।

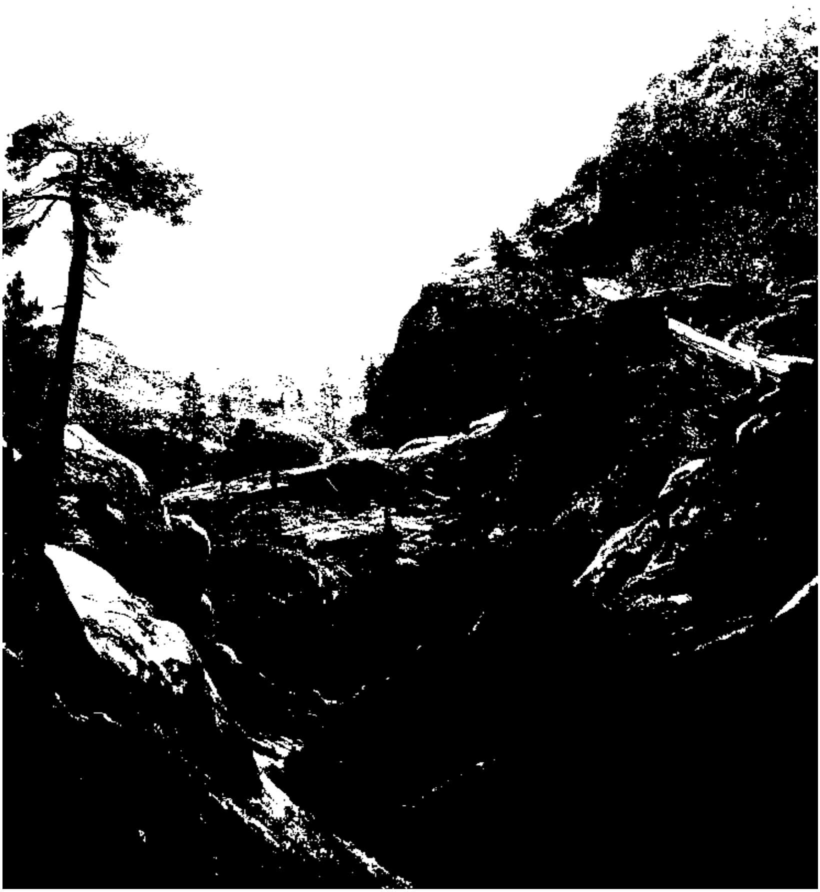

এগার
লুট করে আবার চোখও রাঙায়

সরকারি পঞ্চায়েতের দাপট এখন টোটোপাড়া জুড়ে। বাপ-ঠাকুরদার আমলের পুরানো কাঁঠাল গাছগুলো একে একে বিক্রি হয়ে যায় জলের দরে। কাউকে ধমক, কাউকে হুমকি, কাউকে সামান্য টাকা মদ পান করিয়ে পঞ্চায়েতের বাবুরা সব ওজর-আপত্তি চেপে রাখে। ভাগের টাকা পকেটে পুরে গুটিকয় বাবু-হয়ে-ওঠা জাপেন ও টোটো রাতারাতি বড়লোক হয়ে ওঠে। টোটোজাতি যেন তাদের ঘরে পোষা সোনার ডিম পাড়া হাঁস। আদিবাসী উন্নয়নের নাম করে সরকারি প্রকল্পের টাকা আসে আর তা তাদের ভাই-বেরাদরের ছোট গণ্ডির মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। তারাই মুরুব্বি হয়ে ওঠে। সর্বজনের সভা, দেমসার সভা বা বয়স্কদের সভার আর কোনও গুরুত্ব থাকে না। পার্টিতে নাম লিখিয়ে এরা সব লাল কমরেড। সরকারি দপ্তরও এদের চোখ দিয়েই দেখে, এদের হাত দিয়েই কাজ করে। টোটোপাড়ার সাধারণ মানুষের জীবন যত মলিন হয়, এদের রোশনাই তত বাড়ে। এদের উপার্জনের নতুন নতুন পথ খোলে। গ্রামীণ রাস্তা তৈরির সরকারি কাজের কন্ট্রাক্ট ওঠে এদের নামে, জিপ চালানোর লাইসেন্স বেরোয় এদের নামে। জঙ্গলের গাছ ও পাহাড়-নদীগর্ভের পাথর চালান করার ব্যবসাদাররা এদের খুশি রাখার জন্য মাসোহারা দেয়, কখনও বা এদের ব্যবসার অংশিদারও করে নেয়। এদের ঘরেই প্রথম বিজলির বাতি জ্বলে, বিজলির পাখা ঘোরে, রেডিও আসে, গানের কল আসে, তারপর টেলিভিশনও আসে। বাকি মানুষ অবাক চোখে দেখে। এদের অনুগ্রহের ছিটেফোঁটা পেয়ে জীবনযাপনের কষ্ট কিছুটা লাঘব করার আশায় এদের চারদিকে ঘুরঘুর করে এক দল লোক। ধানুয়ার মতো আরেক দল লোক গভীর যন্ত্রণা নিয়ে দেখে কীভাবে এক নতুন

লুটের জাল বিছানো হয়েছে। চাষের জমি, পশুচারণের জমি, মায়ের কোলের মতো জঙ্গল তো আগেই কেড়ে নিয়েছে, এখন গ্রামের মধ্যের বহু পুরানো বড় বড় গাছ লুটে নিচ্ছে, পাহাড় কেটে নদীগর্ভ খুঁড়ে পাথর লুটে নিচ্ছে। টোটোপাড়ার গায়ে ক্ষত ছড়িয়ে যাচ্ছে। পাথর কাটার প্রভাবে পাহাড়ে ধ্বস নামছে গ্রামের ধার ধরে, চাষজমি উপড়ে নিয়ে। ধানুয়ারা দশজনে কথা বলে ঠিক করল যে এ সর্বনাশ বন্ধ করতে হবে, সেজন্য তারা টোটোপাড়ার সরকারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে গিয়ে পঞ্চায়েতের নেতাবাবুর কাছে দরবার করবে।

নেতাবাবুর পঞ্চায়েত অফিসে আসার কথা বেলা এগারোটায়। অফিসের বাইরে বেড়ার ধারে ঘাস-পাথরের উপর ধানুয়ারা পাঁচজন অপেক্ষা করে। অফিসের ভিতর বিজলি পাখার নিচে কাজি তামাঙ, পেম্বা টোটো, গেদু টোটো ও আরও জনা চারেকও বসে আছে নেতার অপেক্ষায়। ধানুয়া পাথরের উপর বসে দূরে পাহাড়ের নিচে হাউড়ির চওড়া খাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে ভেসে ওঠে বাবার মুখ। মাস চারেক হল বাবা মারা গেছে। শেষ জীবনে বাবার শরীর মন দুটোই ভেঙে গিয়েছিল। সরকারি পঞ্চায়েতের প্রাদুর্ভাবে টোটোসমাজের ঐতিহ্যগত গ্রামসভা ও বিচারসভা ক্রমে মূল্যহীন হয়ে পড়ায় মুখিয়া হিসেবে তার বাবার ভূমিকাও ক্রমশ মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। বাবা তা মেনে নিতে পারেনি। অসুস্থ শরীরটা যখন মৃত্যুশয্যায় নেতিয়ে পড়ল, ঘোরের মধ্যে বাবা যন্ত্রণায় ছটফট করত, দুহাতে কান চেপে মাথা গুঁজে পড়ে থাকত, তার মাথার মধ্যে ভাঙনের শব্দ বাজত, পূর্বপুরুষদের অভিশাপ শুনতে পেত। সুপুরিবাগানে কবরের তলায় এখন বাবা শুয়ে আছে। এখনও কি বাবার কানে ভাঙনের শব্দ বাজছে, অভিশাপ বাজছে ? ধানুয়ার খুব খেদ হয়। বাবার সঙ্গে নানাকিছু আলাপ-আলোচনা করতে অস্থির বাসনা জাগে। মনে হয় বাবা বেঁচে থাকতে কেন সে বাবার আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারল না, কেন বাবার মনের কথা জীবনের অভিজ্ঞতা আরও জানাবোঝার চেষ্টা করল না। কয়েক ফোঁটা জল ধানুয়ার চোখের কোলে টলটল করে। মাথা নিচু করে সে হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকায়। গভীর শ্বাস নিয়ে আবার মাথা তোলে। আকাশের অন্তহীনতায় চোখ মেলে।

দূরে হাউড়ির উপর পথে একটা ছোট ধুলোর বলয়কে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। তার কেন্দ্রে যেন একটা কালো পোকা। ক্রমশ সেই কালো পোকার যন্ত্রগর্জন শ্রবণগ্রাহ্য হয়। নেতাবাবুর জিপ আসছে।

নেতাবাবুর জিপ পাক খেয়ে ধানুয়াদের চোখেমুখে ধুলোর ঝাপট লাগিয়ে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে গিয়ে থামল। যন্ত্রগর্জন থামল। জিপের ভিতর লাগানো গানের কলে উত্তেজক সঙ্গীত বাজছিল। তাও থামল। নেতাবাবুর দামী জুতোয় মোড়া পা বেরিয়ে এসে জিপের পাদানিতে পড়ল। তারপর নেতাবাবুর গোটা শরীরটাই ঝুঁকে বেরিয়ে এল। সাবধানে পাথুরে জমিতে পা নামিয়ে ছিমছাম পোষাকে ঢাকা দেহটা খাড়া হয়ে দাঁড়াল। তারপর ব্যস্ত পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দা পেরিয়ে অফিসঘরে ঢুকে গেল।

ধানুয়ারাও উঠে দাঁড়াল। ধুলো ঝেড়ে অফিসের দিকে এগোল। কিন্তু বারান্দায় ওঠার আগেই পেম্বা টোটো বেরিয়ে এসে তাদের পথ আটকাল। প্রশ্ন করল, কী দরকার ? ধানুয়ার পাশ থেকে নচুয়া টোটো বলল, নেতাবাবুর কাছে কিছু আর্জি আছে। পেম্বা টোটো বলল, এখানেই অপেক্ষা কর, বাবু আগে ভিতরে দরকারি কাজ সারুক, বাবুকে বলে রাখছি, যাওয়ার পথে বেরিয়ে এখানেই তোমাদের আর্জি শুনবে।

ধানুয়ারা সেই বারান্দার নিচে জিপের পাশে ঘাস-পাথরের জমির উপর আবার বসল।

নেতাবাবুর জিপের ড্রাইভার জিপ থেকে নেমে একটা ফিল্টার সিগারেট ধরাল। ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট রেখে একটা ঝাড়ন আর বালতি বের করল জিপের সিটের তলা থেকে। ধানুয়াদের দিকে তাকিয়ে বালতিটা বাড়িয়ে ধরে হুকুমের সুরে বলল, এক বালতি জল এনে দে তো তাড়াতাড়ি। ধানুয়ার মোটেই ভালো লাগল না, এ তো একজন মানুষের আরেকজন মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া নয়, এ যেন সাতজন্মের বাঁধা ক্রীতদাসকে হুকুম করা। কিন্তু ধানুয়া কিছু বলার আগেই লচচে টোটো উঠে গিয়ে বালতিটা নিয়ে জল আনতে চলে গেল। ধানুয়া তার রাগটাকে বুকেই চেপে রাখল, কিছু বলল না। চড়াই পথে কিছুটা উঠে ঝোরার মুখ থেকে জল নিয়ে এল লচচে। ড্রাইভার সেই জল ছিটিয়ে জিপের গা ধুতে লাগল। জলের নোংরা ছিটে এসে ধানুয়াদের গায়ে পড়ছে, কিন্তু ড্রাইভারের তা নিয়ে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এখন তার কাছে ধানুয়াদের শরীরগুলোও যেন কতগুলো পাথরের টুকরোর মতো নিষ্প্রাণ বস্তু হয়ে গেছে। জল ছিটিয়ে ধোয়ার পর ড্রাইভার লাল তোয়ালে কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে জিপের গা মুছতে লাগল। ফুরিয়ে যাওয়া সিগারেট ফেলে তার ঠোঁটে এখন ফিলমি গানের কলি।

ড্রাইভার জিপ ধোয়ামোছা শেষ করে তার সিটে উঠে পিছে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে আছে। ঘন্টা খানেক কেটে গেছে। পঞ্চায়েতের অফিসঘরের পর্দা এবার নড়েচড়ে উঠল। নেতাবাবু বেরিয়ে আসছেন। ধানুয়ারা উঠে দাঁড়াল। নেতাবাবু বারান্দার নিচে নেমে এলেন। তাঁর পিছনে এসে দাঁড়াল কাজি তামাঙ, পেম্বা টোটো, গেদু টোটো ও অন্য কমরেডরাও। নেতাবাবু ধানুয়াদের দিকে তাকিয়ে বলল, কী ব্যাপার তাড়াতাড়ি বল, সময় নেই বেশি।

এতক্ষণের অপেক্ষার পর এই নেতাবাবুর তাড়া দেওয়ায় সাজিয়ে রাখা কথা যেন সব গুলিয়ে গেল। টোটো ভাষায় ভাবা কথাগুলো বাংলায় অনুবাদ করে বলতে গিয়েও আটকে আটকে গেল। তবু ধানুয়া বলল, বাবু, টোটোপাড়ার পুরানো গাছ কেটে বিক্রি করা বন্ধ করুন— পাহাড় কাটায় ধ্বস নেমে যাচ্ছে— ওভাবে পাথর বিক্রি করা বন্ধ করুন।

নেতাবাবুর চোখে প্রথমে ছদ্মবিস্ময়, তারপর বিদ্রূপের হাসি চকচক করে উঠল। তিনি একবার পিছনে মাথা ঘুরিয়ে তাঁর কমরেডদের উপরও চোখ বুলিয়ে নিলেন। কমরেডদের মুখেও তাদের নেতার মুখভঙ্গির অনুকরণ ফুটে উঠল। নাটকীয় স্তব্ধতার মুহূর্ত কয়েক কাটিয়ে নেতাবাবু নাটকীয়ভাবে বলে উঠলেন:

গাঁয়ে বিজলি যাচ্ছে, রাস্তা হচ্ছে, মাসে মাসে গম আসছে, সেগুলো বন্ধ করতে বললে না তো বাপ। খালি সরকারের কাছ থেকে শুষে নেবে, সরকারকে কিছু দেবে না, তাই না। ওই পাথর চুষে গাছের তলায় পড়ে থাকতে পারবে তো! যতসব ঘোঁট পাকানোর বাবাজি। তুই তো ধানুয়া, নিষ্কর্মা হতচ্ছাড়া। বাপ-ঠাকুরদার জমিদারি রক্ষা করার জন্য দল পাকাচ্ছিলি এতদিন, এখন আবার সরকারের গ্রামোন্নয়নের কাজেও বাধা দিতে এসেছিস! আর তুই নচুয়া না ? গাঁয়ে দাঙ্গা বাঁধানোতে উশকানি দেওয়ার জন্য তোকে থানায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল না। বড়বাবুর কড়কানি কাজ করেনি দেখছি! আবার ঝামেলা পাকাতে এসেছিস। কাজি, পেম্বা, গেদু, তোমরা এই ছোঁড়াগুলোর উপর নজর রেখ ভালো করে। উন্নয়নের কাজে বাধা দিতে আসা কোনও প্রতিক্রিয়াশীলদের আমরা ক্ষমা করব না। তার জন্য যতদূর যেতে হয় আমরা যাব, যাকিছু করতে হয় আমরা করব। থানার বড়বাবুকেও আমি হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখছি এদিকে নজর রাখার জন্য।

একটানা বলে গেলেন কাউকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে। ব্যাঙ্গাত্মক স্বরে শুরু করে ক্রমশ ক্রোধে ঘৃণায় তাঁর গলা কাঁপতে থাকল। কথা শেষ করে আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করে জিপে উঠে বসলেন। জিপ যন্ত্রগর্জনে গর্জে উঠল।

বারো
প্লাবন ও রিলিফ

বর্ষাকাল হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর। বৃষ্টিধারা আর থামে না। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন বৃষ্টি ঝরেই চলেছে। টোটোপাড়ার চারদিকের সব নদী ফুলে ফেঁপে উঠেছে। যে নদীগুলো আনমনা ভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কিশোরীর খেলে বেড়ানোর ভঙ্গিতে ছুটে চলে, তাদের রূপ আজ পাল্টে গেছে। সর্বগ্রাসী মাতঙ্গিনী চেহারায় ক্রোধ ও আক্রোশ উগরে দিতে দিতে প্লাবন বইয়ে দিচ্ছে। সরু ফিতের মতো ঝোরাগুলোও রূপ পাল্টে ঘুমভাঙা ক্ষুধার্ত অজগরের মতো দুপাশের পাথর ও মাটি গিলতে গিলতে ধেয়ে চলেছে। ধস নামছে এদিকে ওদিকে। বাড়ি উপড়ে নিয়ে, গাছ উপড়ে নিয়ে, জমি উপড়ে নিয়ে, পথ উপড়ে নিয়ে ধস অতর্কিতে খাদে ঝাঁপ দিচ্ছে টোটোপাড়ার গায়ে ক্ষতের জন্ম দিয়ে। হাউড়ির প্লাবন টোটোপাড়াকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে বাইরের জগৎ থেকে। জঙ্গলে সংগ্রহ করতে যাওয়ার উপায় নেই। সাধারণ ঘরে তাই খাদ্যে টান পড়তে শুরু করেছে। বেশিরভাগ ঘরে চাল বা গমে টান পড়েছে। অনেকে খিদে মেটাতে পোষা শুয়োর আর মুরগিগুলোকেও জবাই করে ফেলেছে। অনাহারের ছায়া গভীর হচ্ছে। বাচ্চাগুলো কাঁদছে, বাবা-মায়ের মুখ থমথমে। পঞ্চায়েতি কারবার করে যাদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, তারা দুয়ার বন্ধ করে রেখে যেমন বৃষ্টির ছাঁট আটকায়, তেমনই অভাবী প্রতিবেশীদেরও সাহায্য চাইতে আসা আটকায়। তাদের ঘরে খাবারের যোগান আছে এখনও, তবু তাদের কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ কেটে বসেছে।

ধানুয়া আর চম্পাকলি পাড়ার অন্যদের সঙ্গে বৃষ্টির মধ্যেই আশপাশ থেকে কন্দ, মূল সংগ্রহ করে। জোঁকগুলো কখন পায়ে কামড়ে বসে

অনেকসময় টেরও পায়না, রক্ত শুষে ফুলে ওঠে তারা। বাড়ি ফিরে জোঁকগুলোকে ছাড়িয়ে বাড়ির বারান্দায় একে অপরের গায়ে হেলান দিয়ে খানিক্ষণ নীরবে বসে থাকে তারা। বৃষ্টিভেজা শরীরদুটো একে অন্যের ওমে উষ্ণ হয়ে নিতে চায়। নীরব সান্নিধ্য দিয়ে একে অপরকে ভরসা যোগাতে চায়, শক্তি যোগাতে চায়। তারপর কন্দ আর শিকড়গুলো ধুয়ে নিয়ে জলে ফুটিয়ে সিদ্ধ করে, জ্বালানি কাঠ বাড়ন্ত হলে ছোট ছোট কুঁচোয় কেটে নেয়। চালের ভাঁড়ারের তলানিতে পৌঁছে যাওয়া চাল থেকে অল্প একমুঠো নেয়, ফুরিয়ে যেন না যায়। সেই আধমুঠো চালও সিদ্ধ করে নেয়। তারপর সাগ্রহ অপেক্ষায় বসে থাকা চার সন্তানকে খেতে দেয়। বেশিরভাগ দিন তাদের দুজনের জন্য আর কিছুই পড়ে থাকেনা।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার দিকে চোখ রেখে, প্লাবনের গর্জন আর অতর্কিতে ধস নামার শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে শুনতে ধানুয়ার মন বিষাদময় হয়ে ওঠে। মনে ঘুরপাক খায় একটাই আক্ষেপ। গাছ কাটা আর পাহাড় কেটে নদীগর্ভ খুঁড়ে পাথর বিক্রির দুষ্কর্মটা যদি আটকানো যেত তাহলে ধসের পর ধসে এমন ক্ষতবিক্ষত হতে হতনা তার মাতৃভূমিকে।

কয়েকদিন হল বৃষ্টি ধরেছে। হাউড়ি অবশ্য এখনও ফুলেফেঁপে রয়েছে, রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা। টোটোপাড়া থেকে মাদারীহাট জিপ চলা এখনও শুরু হয়নি। মাদারীহাট থেকে বি ডি ও তাঁর দলবল নিয়ে টোটোপাড়া পরিদর্শন করতে এলেন। সরকারি অফিসার ছাড়াও তাঁর সঙ্গে গরিব মেচ ও মুণ্ডা কুলির দল। সরকারি বাবুরা কিছু রাস্তা হেঁটে এসেছেন, আর পথের মধ্যের রাস্তা উপড়ে যাওয়া ধসের এলাকাগুলো বা এখনও খরস্রোতে বেসামাল নদীগর্ভগুলো এই কুলিরা বাবুদের কাঁধে করে পার করিয়েছে। বাবুরা পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে বসলেন। কুলিরা অফিসের বারান্দায় হাত-পা ছড়িয়ে গা এলিয়ে দিল। নেতা হরেকৃষ্ণবাবুও বি ডি ও-র সাথে এসেছেন। কাজি তামাঙ আর গেদু টোটোর বাড়ি থেকে সুদৃশ্য পেয়ালা-পিরিচে সাজিয়ে চা ও বিস্কুট এল। ঘন্টাখানেকের মধ্যে মুরগির মাংসের ঝোল আর তাজা পাঁউরুটি এল। সব বাবুদের জন্য। ব্যবস্থা হরেকৃষ্ণবাবুর নির্দেশেই করে রাখা ছিল। কুলিদের দেওয়া হল একবাটি করে ইউ আর ভুট্টা। খেয়েদেয়ে, বিজলি পাখার হাওয়ায় শরীর শান্ত করে, বাবুরা পঞ্চায়েত অফিসে আরাম করে বসলেন। হরেকৃষ্ণবাবু এবং বড়-মেজ-ছোট বিভিন্ন মাপের অন্যান্য কমরেডরা তাঁদের সামনে বসলেন।

হরেকৃষ্ণবাবু প্রথম বললেন, বিডিওসাহেব মিঃ চ্যাটার্জি, এই দুর্গম পথ পায়ে পেরিয়ে আপনি যে আসতে পারবেন তা ভাবাই যায়না।

বড়-মেজ-ছোট কমরেডরা চারদিক থেকে গুঞ্জন তুলল: 'বিডিওসাহেব ধন্য', 'বিডিওসাহেব ভগবান', 'পায়ে গড় করি বিডিওসাহেব'।

বিডিওসাহেব তাঁর দামি শার্টের উপরের দুটো বোতাম খুলে পিছনের কলার ধরে পিছে টেনে গায়ের থেকে কিছুটা আলগা করে নিলেন, আরামকেদারায় গা এলিয়ে মুখে মৃদু হাসি টেনে বললেন:

আসলে হরেকৃষ্ণবাবু, এ হল ওয়ার্ক এথিকসের প্রশ্ন। নিজে সরেজমিনে না ভিজিট করলে ড্যামেজের ইভ্যালুয়েশনে গণ্ডগোল থেকে যায়, করাপশন র‍্যামপ্যান্ট হয়, সরকারের টাকা জলে যায়। আমার মোরাল ডিউটি আমি অস্বীকার করতে পারিনা। আর পায়ে হেঁটে আসার কথা বলছেন, তাহলে শুনুন হরেকৃষ্ণবাবু, কলেজে পড়ার সময় এভরি ইয়ার হিমালয়ান ট্রেকিংয়ে যাওয়া ছিল আমার প্যাশন। কোথায় যাই নি ! পঞ্চকেদার, রাউন্ড অন্নপূর্ণা, কুঁয়ারি পাস... বলে এখন শেষ করতে পারব না। উইকলঙ নাগাড়ে হেঁটেছি। আর জলেও আমার ভয় নেই। কলকাতার অ্যান্ডারসন ক্লাবে আমার নাম ছিল জলকুমির, সুইমিং পুল তোলপাড় করা ছিল আমার হবি। আজ না হয় সরকারি গাড়িতে ঘোরাফেরা করি। কিন্তু বডির মাসেল-স্ট্রাকচারটাতো আর নষ্ট হয়নি।

বলতে বলতে তিনি সস্নেহে তাঁর মাসেল-স্ট্রাকচারে হাত বুলোচ্ছিলেন। অবশ্য তাঁর মাসেল-স্ট্রাকচারে এখন সবচেয়ে দর্শনীয় রূপ নিয়েছে তাঁর ভুঁড়িটি। চর্বি বা মেদ যদি মাসেল হয় তবে সেখানকার মাসেল-সমাগম হ্যামিল্টনগঞ্জের মেলার রাতের জনসমাগমকেও হার মানিয়ে দেয়। সদ্য মুরগির মাংস উদরস্থ করার খুশিতে তা এখন তাঁর টানটান হয়ে ওঠা দামি শার্টের তলায় তিরতির করে কাঁপছে।

হরেকৃষ্ণবাবু ও অন্যান্য কমরেডরা গদগদ ভঙ্গিতে বিডিওসাহেবের কথাগুলো যেন গিলছিল, দূর হিমালয়ের দুর্গম পথ আর অজানা অ্যান্ডারসন ক্লাবের সুইমিং পুলের উথালপাথাল জল তাদের মনে যেনবা অপার বিস্ময় ও সমীহ তৈরি করছিল, এবং তা তাদের চোখমুখ ছাপিয়ে উপছে পড়ছিল।

সরকারী বাবুদের অন্যরা কেউ কেউ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উসখুস করতে শুরু করেছিল। সরকারি বনবাংলোয় গিয়ে বিছানার আশ্রয় নিতে এখন তাঁদের মন টানছে। বিডিওসাহেবেরও নজরে পড়ল তা। তিনি গলা

খাঁকারি দিয়ে কাজের কথায় ফিরে এলেন। হরেকৃষ্ণবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন:

আমার তো আর ঘুরে দেখার কিছু নেই হরেকৃষ্ণবাবু। আপনি আপনার লোকজন দিয়ে ডিজাস্টার রিলিফের ফর্মগুলো ফিল আপ করিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। যত তাড়াতাড়ি ডিসবার্সাল করা যায় আমি করে দেব।

হরেকৃষ্ণবাবু হেসে বললেন, এ আর এমন কী কাজ বিডিওসাহেব, তিন দিনের মধ্যেই আপনার অফিসে পূরণ করা ফর্ম পৌঁছে যাবে।

বাবুরা সব উঠলেন। সরকারি বনবাংলোর দিকে চললেন। গেদু টোটোর বাড়ির দাওয়ায় প্লাসটিক-তিরপল টাঙিয়ে কুলিদের রাত কাটানোর বন্দোবস্ত হয়েছিল, কুলিরা সেদিকে চলল। কাল ভোরেই আবার তাদের বিডিও ও অন্য সরকারি বাবুদের দশাসই শরীরগুলোকে তো কাঁধে বয়ে নদী আর ধসা জায়গা পার করাতে হবে।

তিনদিনের মধ্যে বিডিও-র অফিসে ফর্ম জমা পড়ে গেল, নেতাবাবুরা এবং তাঁদের নেকনজরে থাকা লোকজনদের নামে ফর্ম ভরা হয়েছিল, তাঁদের হাতে মাস না ঘুরতেই সরকারি রিলিফের টাকা পৌঁছে গেল। আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়াদের আঙুলগুলো আরও কিছুটা ফুলল। ধানুয়া ও অন্যান্য সাধারণ টোটো মানুষরা কিছু পেল না। তাদের জীবনযাপন জুড়ে ক্ষত আরও গভীর হল।

ধানুয়ারা চুপ করে বসে নেই। সরকারের মুখের দিকে হাপিত্যেশ চেয়ে বসে থাকার বদলে নিজেদের উদ্যোগে কী করা যায় তা নিয়ে আলাপ-আনোচনা করেছে। ঠিক করেছে দল বেঁধে চেষ্টা করতে হবে। ধানুয়া, বিশু, হারু, নচুয়ার সঙ্গে যোগ দিয়েছে হরে টোটো, নিকল টোটো, রনে টোটো আর শনে টোটো। টোটোপাড়ার গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষকে জড়ো করে সমবেত শ্রমে তারা বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। ভেঙে পড়া ঘর সারাই করতে কাঠ, পাথর জোগাড় করে এনে সবাইকে জড়ো করে কাজ করে। ধস নামা জায়গাগুলোর ধার পাথর বসিয়ে বাঁধাই করার চেষ্টা করে যাতে আরও ধস আটকানো যায়। নজরদারি শুরু করে যাতে গ্রামের পুরানো বড় গাছ আর কেউ কাটতে না পারে। দল বেঁধে জঙ্গল সংগ্রহ করে এনে বয়স্ক অশক্ত মানুষদের মধ্যে বিলি করে। ধানুয়ার মন যেন শান্তি খুঁজে পায়। নেতাবাবু ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ক্রোধের জ্বালানি শুধু মনকে পুড়িয়ে

কালো আঙার করে, কিন্তু এই সকলে মিলে একে অপরের সহায় হয়ে বাঁচার চেষ্টা মনকে উপশম দেয়, মনকে আবার সবুজ করে তোলে। তবু তারা আর উপেক্ষা করে যেতে পারল না যখন সরকারি রিলিফের টাকা তেল হয়ে তেলা মাথাতেই পড়ল, শুকনো রুক্ষ মাথাগুলোতে পড়ল না। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তারা ঠিক করল বিডিওবাবুর কাছে সরাসরি তারা নালিশ জানাবে, প্রতিকারের প্রার্থনা করবে।

ধানুয়ারা দল বেঁধে হেঁটে মাদারীহাট পৌঁছয়। তারপর সেখান থেকে যায় বিডিও-র দপ্তরে। বিডিও তাদের কথা শোনেন, কোন কোন ক্ষতিগ্রস্ত রিলিফের টাকা পায়নি তাদের নাম লিখে নেন কাগজে। তারপর আশ্বাস দেন যে প্রতিকারের ব্যবস্থা তিনি করবেন। ধানুয়ারা খুশি মনেই ফিরে আসে টোটোপাড়ায়।

পরের দিনই মাদারীহাট থানা থেকে পুলিশের বাহিনী নিয়ে স্বয়ং দারোগাবাবু হাজির হলেন টোটোপাড়ায়। গেদু টোটোকে ডেকে নিয়ে সটান হাজির পাখা গ্রামে শনে টোটোর বাড়ি। শনে টোটোকে হাতকড়া পরিয়ে গ্রেফতার করে টেনে নিয়ে এল টোটোপাড়া বাজার চত্বরে। টোটোপাড়ার মানুষরা চারদিক থেকে ছুটে এসে সেখানে ভিড় জমিয়েছে। দারোগাবাবু সেখানে হাতকড়া পরানো শনেকে পাশে দাঁড় করিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তাঁর বাংলা ভাষণ আবার গেদু টোটো টোটোভাষায় অনুবাদ করে বলে দিল। দারোগাবাবু জানালেন যে শনে টোটো পঞ্চায়েত-কর্তা তপনবাবুর নামে মিথ্যা কথা রটিয়ে তাঁর সম্মানহানি করেছে, তপনবাবুর উপর হামলা করার ষড়যন্ত্র করেছে, তার এখন উচিত সাজা হবে, তার সঙ্গে আর যারা দল পাকাচ্ছিল তারাও যেন সাবধান হয়, নইলে তাদেরও একই হাল হবে, পঞ্চায়েতের জনকল্যাণমূলক কাজে গুণ্ডামি করে বাধা পাকানো বরদাস্ত করা হবেনা। ধানুয়ারা প্রতিবাদ করে মুখ খুলতে গেলেই দারোগা বজ্রকন্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন, বললেন যে আইনের কাজে কেউ বাধা দিতে এলে তাদেরকে এখানেই কুকুরের মতো লাঠিপেটা করা হবে। তাঁর পুলিশবাহিনীও লোহার গাঁট লাগানো লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে এল। গ্রামের লোকরা তাড়াতাড়ি ধানুয়াদের ঘিরে ধরে সেখান থেকে ঠেলতে ঠেলতে সরিয়ে নিয়ে গেল। দারোগাবাবু ও তাঁর বাহিনী শনেকে নিয়ে চলে গেল।

শনেকে হাজতে পোরা হল। ধানুয়ারা বুঝল যে বিডিওসাহেবের প্রতিকার এভাবেই ফলল। কিন্তু শনেকে এখন মুক্ত করে আনা যায় কীভাবে?

টোটোপাড়ায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে সুপারি কিনে নিয়ে যায় যে ব্যবসায়ী তার সাথে পুলিশের অনেক চেনাশোনা-যোগসাজস আছে। সে ধানুয়াদের জানাল যে পুলিশের ভিতর থেকে সে খবর পেয়েছে যে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা দিলে শনেকে পুলিশ ছেড়ে দেবে, আর তা না করে আইন-আদালত অবধি গড়ালে শনেকে বছরের পর বছর জেলে পচতে হবে। কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা তো অনেক, ধানুয়ারা তা কোথা থেকে জোগাড় করবে ? সেই সুপারি ব্যবসায়ীই আবার পথ বাতলাল, বলল সে তাদের এই টাকা ধার দিতে পারে। ধানুয়ারা একে অন্যের মুখ চায়, ধার তারা শোধ করবে কীভাবে। সুপারি ব্যবসায়ী তারও পথ বাতলে দিল। বলল যে আসছে মরসুমে তাদের গাছের সুপুরি বাজারের আধা দামে তাকে বিক্রি করার শর্তে যদি তারা লিখিতভাবে রাজি হয়, তাহলে তাদের কোনও সুদ দিতে হবে না, সুপুরির দাম থেকেই এই পাঁচ হাজার টাকা কেটে নেবে সে। ধানুয়াদের সামনে আর কোনও পথ রইল না। ধানুয়ারা পাঁচজন তাদের সুপুরি আধাদামে বিক্রি করার চুক্তিপত্রে সই করল। বছরের রোজগার এই দুর্দিনে অর্ধেক হয়ে যাওয়ার শর্তে তারা হাতে পেল শনেকে ছাড়ানোর টাকা। সেই টাকা দিয়ে মাদারীহাট থানার হাজত থেকে তারা শনেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল।

তের
চম্পাকলির প্রস্থান

দাদুয়া দিনে দিনে বড় হয়েছে। তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল ধানুয়া। কিন্তু পড়াশোনায় তার মন বসেনা কিছুতেই। কোনও রকমে চতুর্থ শ্রেণি পাস করে আর স্কুলে যায়নি।

দাদুয়া দিনে দিনে বড় হয়ে বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দুরন্তপনার শেষ নেই। মাঝেমধ্যে বখাটে হয়ে ওঠে। দাদুয়ার কাজের জন্য দু-একবার সমাজে সালিশি বৈঠকও বসেছে। বয়স হলে দাদুয়াকে সামাজিক রীতিতে বিয়ে দিয়ে আলাদা ঘর করে দেয় ধানুয়া। দাদুয়ার ঘরেও নবজাতক আসে। ঘরদুয়ার-সংসারে জড়িয়ে যায় দাদুয়া।

এদিকে সংসার-খরচ জোগাড় করতে হিমশিম খায় ধানুয়া। ভুটান থেকে দারচিনি রিঠাফল জোগাড় করে নিয়ে এসে সংসার-খরচ সংস্থান করে। কিন্তু চম্পাকলির মুখে কোনও দুঃখের চিহ্ন নেই। দুর্দিন আর যন্ত্রণার সংসার সে মেনে নিয়েছে। কারও কাছে ধার চাইলেও ধানুয়াকে এখন আর কেউ বিশ্বাস করেনা। ধার শোধ করতে কি আদৌ পারবে ধানুয়া ? আপনজনরাও কেমন এড়িয়ে চলে। ভুখা পেটে ভুটানের এ পাহাড় ও পাহাড় পেরিয়ে রিঠাফল আর দারুচিনি ছাল সংগ্রহ করে ধানুয়া। সরকারি পঞ্চায়েতের কাছে কিছু দাবি করলে উল্টে ঠাট্টা-মস্করা শুনতে হয়: তোরা হলি মানী বড়লোকের বেটা, তোদের আর সরকার কী সাহায্য করবে ? পঞ্চায়েত-বাবুরা আড়ালে হাসে। নেতাবাবুদের ধামাধরারা এখন মাতব্বর। তারা হল পঞ্চায়েতবাবুদের চারণকবি। পড়াশোনা না থাকলেও গ্রামে সরকারি কাজে সুপারভাইজার পদে তারা নিযুক্ত। ঘরের থেকে মুখ ফিরিয়ে পঞ্চায়েত বাবুদের শোনানো বুলি গাঁয়ে ঘুরে কাব্যি করে শোনায়, আগামী দিনে কী কী

উন্নতি হতে চলেছে তার ফিরিস্তি রচনা করে। গেদু টোটো মাঝেমাঝে বাজারে পঞ্চায়েতবাবুর সামনে মাথা নত করে বলে, হুজুর নমস্কার, আপনার মতো পঞ্চায়েতবাবু আগে কখনও দেখিনি, আমার কাছে আপনি সাক্ষাৎ ভগবান।

ধানুয়ার বুকে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলে। কী করবে ভেবে পায় না। তবে তার বুকে আগুন জমতে থাকে। হয়ত প্রতিশোধ নয়, কিন্তু ভণ্ডামির মুখোশ পরা অত্যাচার-অনাচারের মুখোশ টেনে খুলে মুখের উপর জবাবটা তো দেওয়া দরকার।

দুঃখের দিনগুলো ধীরগতিতে কাটে, আরও দীর্ঘ হয়ে ওঠে। আপনজনেদের কাছে, সমাজের কাছেও ধানুয়ার জীবন যেন মূল্যহীন। অস্থির হয়ে উঠে ধানুয়া চম্পাকলিকে বলে, কত কষ্ট তোমায় দিলাম চম্পাকলি, ভালো করে খাওয়াতেই পারলাম না, কী যে করব! চম্পাকলি মধুর মিষ্টি স্বরে বলে, যা খাচ্ছি তাই আমার কাছে অনেক. ওসব চিন্তা কোর না তো, শুয়ে পড়, কাল গ্রামে কোনও নতুন কাজ পাও কি না দেখ।

গ্রামে কাজ নেই। দি-তি নদীর পাশে জঙ্গলে পিপলা ফল পাওয়া যায়। শুকনো হলে ওই ফল মহাজন কেনে। ধানুয়া আর চম্পাকলি ওই ফল সংগ্রহ করে আনে। কোনও কোনও দিন দেড়-দুই কেজি ফল সংগ্রহ হয়ে যায়। কোনও দিন আবার এক কেজিও হয়না। আর বর্ষার দিনে বুনো পোকামাকড় আর জংলি জোঁক রক্ত শুষে খায়। অভাব-অনটন না জংলি জোঁক— কে বেশি রক্ত শোষে ?

পিপলা আর জংলি শাকের ঝুড়ি পিঠে নিয়ে বাড়ি ফেরে ধানুয়া। বিকেলের রঙ লেগেছে আকাশে। আজ চম্পাকলি যেতে পারেনি, ঘুসঘুসে জ্বরে তার শরীরটা বেশ নাকাল। ধানুয়াকে দেখেই কিন্তু অনাবিল হাসির মধুতে চম্পাকলির মুখ উপছে ওঠে। বলে ওঠে, ওগো, এতকিছু সংগ্রহ করে আনলে ? ধানুয়ার শরীর-মন যেন এক ঝটকায় হালকা হয়ে ওঠে, বলে, তোমার প্রিয় খাবার এই জংলি ছত্রাকগুলোও পেয়েছি।

চম্পাকলির চোখদুটো যেন সোহাগি বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে ওঠে, বলে, উফ, কী নধরকান্তি ছত্রাক, আজ মনের সুখে দুমুঠো ভাত খাওয়া যাবে।

ধানুয়া পিঠের ঝুড়ি নামিয়ে রেখে বসে। চম্পাকলি চালুনির মধ্যে পিপলা ফলগুলোকে ঢেলে শুকোতে দেয়। উনুনে কাঠ পুড়ে আগুন দিয়ে আসে।

ধানুয়ার হাতে এক বাটি ইউ দিয়ে যায়। উনুনে আঁচ পাকা হলে জংলি ছত্রাকগুলো কড়াইয়ে করে উনুনে চড়িয়ে দেয়।

কিন্তু সংসার টানার বোঝা, তিন ছেলে ও এক মেয়েকে লালনপালন করার বোঝা চম্পাকলির জীবনে বুঝি অতি ভারী হয়ে চেপে বসেছিল। সে নিজে কোনওদিন জানান দেয়নি, তবে তার শরীর জানান দিল। দিনে দিনে শরীর ঝরে পড়তে লাগল। ডাক্তার-কবিরাজ দেখিয়েও তা আটকাল না। একসময় সে পুরো বিছানাতেই পড়ে গেল। ধানুয়ার বিষাদ অনন্ত করে দিয়ে চম্পাকলি একদিন চলে গেল।

ধানুয়া শুধু তার জীবনটাকে উলটেপালটে বিচার করে কী দোষ সে করেছিল যে চম্পাকলি তাকে ছেড়ে চলে গেল।

সুপারি বাগানে চম্পাকলির কবরের পাশে গিয়ে বসে থাকে। বলে, চম্পাকলি, তুমি শুয়ে আছ। তোমাকে দেখতে এসেছি।

কবর থেকে চম্পাকলিও কি নির্বাক চাউনি মেলে তাকে দেখে ?

ধানুয়া বলে:

তোমার আদরের দুই নাতি-নাতনি দ্রানশিং আর হেমা বড় হয়েছে। তোমার ছেলে দাদুয়া এখন সংসারের কাজে মনোযোগী। ওর বখাটে রোগ আর নেই। ওর জন্য তোমাকে-আমাকে কত না কথা শুনতে হয়েছে, সমাজে সালিশিতে কত না অপমান মানতে হয়েছে। যারা আমাদের অপমান করেছিল তাদের ছেলেমেয়েরাও এখন বখাটে হয়েছে। মুখিয়ার ছেলে, পঞ্চায়েতবাবুর ছেলেরাও বখাটেপনা করে, সমাজ-সালিশিতে তাদেরও এখন ক্ষমা চাইতে হয়। তোমার মনে দাদুয়াকে নিয়ে কোনও দুঃখ নেইত চম্পাকলি ? তাই তোমায় বলছি। তোমার মনে কোনও দুঃখের দাগ রেখনা।

পুদুয়া, হিসপা পাহাড় থেকে আসা হাওয়া সুপুরি গাছের পাতায় বোল ফোটায়। হাউড়ির জল গুনগুন করে চলে অন্তহীন। রোদ আর ছায়া দাগা কাটে আবার মুছে ফেলে। ধানুয়া আবার বলে:

তোমার প্রিয় টোটোপাড়া পড়ে আছে, তুমি নেই। যে জঙ্গলে গরু চরাতে নিয়ে গিয়ে তুমি প্রাণ খুলে গান করতে, ঝোরার ধারে যেখানে তুমি পাথরনুড়ি নিয়ে খেলাঘর বানাতে, সে সব তেমন আছে, তারা কি তোমার অভাব বোধ করে না ? সেখানে আবার কেউ গান গাইবে, আবার কেউ খেলাঘর বানাবে ? কিন্তু আমি কী করব চম্পাকলি ? আমার জীবনে তো আর গান হবেনা, আর খেলাঘর বানানো হবেনা। তোমার মতো আমিও একদিন মাটির

তলায় শুতে আসব। কিন্তু ততদিন? এ ব্যথার বোঝা বইব কীকরে চম্পাকলি ?

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে ধানুয়া। তারপর আবার বলে:
দেখলে তো চম্পাকলি, আবার সেই দুঃখের কথা মেলে বসেছি। হেসে উঠে চোখের ঝলক দিয়ে তুমি আমায় সুখ চেনাতে। দুঃখগুলোকে তুমি সুখের কাপড় পরাতে। কত উপহার তুমি দিয়েছ। তোমার প্রিয় নাতি-নাতনি দ্রানশিং আর হেনার জন্য তোমার-আমার উপহার হিসেবে তোমার কবরের পাশে আমি কাঁঠাল, আম, লামপাতি গাছ বসিয়েছি। রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে আমি এদের জল দিতে আসি। আমার পায়ের আওয়াজ নিশ্চয়ই শুনতে পাও। তুমি এই গাছগুলোকে বড় করে তুলবে। এগুলো আমরা নাতি-নাতনিকে দিয়ে যাব।

মিঠে গলার এক পাখির কাকলি ভেসে ওঠে। ধানুয়া এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে নজরে পায়না। সে ধীরে ধীরে বলে:
হ্যাঁ চম্পাকলি, আমারও যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। তোমার-আমার প্রিয় জঙ্গলে চলে যাব। যেখানে পাখির সাথে গলা মিলিয়ে তুমি আমাকে গান শুনিয়েছিলে।

চোদ্দ
ধানুয়ার কথকতা

ধানুয়া টোটো পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে চম্পাকলি-হীন জীবন অতিবাহিত করার উপায় খোঁজে যেন। এ গ্রাম বা ও গ্রামের পথে নাতিপুতির বয়সীদের সঙ্গে আলাপ জমায়, নানা পুরাতন গল্প শোনায়। দেখতে দেখতে বেশ কিছুজন ধানুয়ার গল্পের টানে বাঁধা পড়ে। ধানুয়াকে দেখলেই তারা ঘিরে ধরে, গল্প শুনতে চায়। এদেরই টানে ধানুয়া যেন আবার জীবনের অঙ্গনে ফিরে আসে।

ধানুয়া তখন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র, মিশন স্কুলে শিক্ষক ইতিহাসের গল্প বলত। শক্তির চেয়ে বুদ্ধি বড়। দিল্লির সম্রাট ইব্রাহিম লোধির তখন এক লক্ষ সৈন্য। হাতি, পদাতিক, তির-ধনুকের গুনতি নেই। অথচ বাবরের কয়েক হাজার মুঘল সৈন্য আর কামান-গোলাবারুদ তাকে পরাজিত করেছিল। ধানুয়া বলে, শোন বন্ধুরা আমরা টোটো জনজাতি সংখ্যায় অল্প, তবু যাদের সংখ্যা অনেক, ক্ষমতা অনেক, তারাও আমাদের দাবিদাওয়া মানতে বাধ্য হবে, আমাদের অধিকার স্বীকার করতে বাধ্য হবে যদি আমরা আমাদের বুদ্ধি হারিয়ে না বসি।

ক্ষমতাকে ভয় কিসের? অত যে দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যের ক্ষমতার চূড়ায় বসে ছিল ইংরেজরা, তাদেরও তো নাকাল করে ছেড়েছিল আমাদেরই মতো জনজাতির মানুষ কোল, ভিল, মুণ্ডা, সাঁওতালরা। নাকাল ইংরেজরা তাদের বদনাম করেছিল দস্যু বলে, তাই বলে কি তাদের মাথা নোয়াতে পেরেছিল? ধানুয়া সেইসব ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নানা উপাখ্যান বলে।

গল্প শুনতে শুনতে ওয়ানচু টোটো, গেঠে টোটো-র মতো তরুণরা প্রশ্ন করে, ধানুয়া কাকু, আমরাও কি বিদ্রোহ করব?

ধানুয়া টোটো বলে :

আসল বিদ্রোহ হল নিজেদের ইতিহাস জানা, নিজেদের বাপদাদাদের বয়ে আনা রীতিনীতি জ্ঞান স্মরণে রাখা, নিজেদের মতো করে বাঁচা। আমরা যদি নিজেদের সব ভুলে অপরে কারা কী করছে অনুকরণ করার জন্য হন্যে হয়ে বেড়াই, তবে হাজার অস্ত্র নিয়ে হাজার মারামারি করলেও তা বিদ্রোহ নয়। আমরা টোটোরা কোথা থেকে এসেছি, কেমন ভাবে সমাজ গড়েছি, কেমন ভাবে বেঁচেছি, পাহাড়-জঙ্গল কীভাবে আমাদের লালন পালন করেছে এসব কথা আমাদের জানতে হবে। বারবার আমি তাই বলতে চাই। টোটোজাতির ইতিহাস ভুলে গেলে টোটোজাতিও আর থাকবে না।

ধানুয়া বলে চলে:

আমার বাবা ও আমাদের প্রধান পুরোহিত কাইজি ছোটবেলায় আমায় অনেক গল্প শোনাত। বলত, আমাদের পূর্বপুরুষরা একসময় সবার উঁচু পাহাড়ে বাস করত। ওই যে উত্তরের হিমালয়, তারও ওপারে আছে অনেক উঁচু উঁচু পাহাড়। সেইসব পাহাড়ে শত শত বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা জন্মেছিল। সেখান থেকে একসময় তারা সমতলের দিকে যাত্রা করে। এদিক ওদিক কাউন চাষ করতে করতে, শিকার করতে করতে তারা আরও সমতলের দিকে চলে আসে। ভুটানের লিন্ডিং জাডে, তাপা গ্রামে ঘর বাঁধে। কিছু বছর পর আবার তারা দল বেঁধে পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করল। কত ঘন জঙ্গল পেরিয়ে সলসলবাড়ি নামের জায়গায় ডেরা বাঁধল। সেখানে আশপাশের জঙ্গলে অনেক বন্য জন্তু পাওয়া যেত। অনেক বছর তারা শিকার করে জীবন কাটাল। তারপর সেখানে বন্য জন্তুর অভাব দেখা দিল। টোটোরা একদিন উত্তরের জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে কিছুই পেলনা। সারাদিন ঘুরে একটা শিকারেরও দেখা মিলল না। জঙ্গল নিস্তব্ধ, যেন প্রাণহীন। কী এর কারণ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অথচ শিকারযাত্রার আগে সকালবেলা বুড়ো পুরোহিত একটা লাল মোরগ বলি দিয়ে বলেছিল যে মোরগের কাটা মুণ্ড উত্তর দিক নিদর্শন করছে। সেই অনুয়ায়ীই তো টোটো জনজাতির শিকারিরা উত্তরদিকে শিকার করতে এসেছে।

এই অবধি বলে ধানুয়া থামল। দুই হাতে ধরে ইউয়ের বাটিটা তুলে লম্বা চুমুক দিল। তরুণ ওয়াংদি টোটোর আর তর সইল না, বলে উঠল, তারপর কী হল ধানুয়া দাদু?

ধানুয়া হাতের পিছনটা দিয়ে মুখের চারপাশে দাড়ি-গোঁফে লেগে থাকা ইউ মোছে। পুদুয়া পাহাড়ের দিকের দূর আকাশ থেকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনে। টানা শিসের মতো একটা পাখির ডাক কোনদিক থেকে যে ভেসে আসছে বোঝা যাচ্ছে না, কান পেতে তার দিক ঠিক করতে আরেকবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। ওয়াংদির প্রশ্নটা যেন আবার তার কানে ফিরে এল। ওয়াংদির দিকে ফিরে তাকাল, মুখে ভেসে উঠল একটুকরো হাসি। গোল চাঁদটা যেমন হাউড়ির জলে পড়ে কাঁপে, সেই হাসির উপরেও বেদনা তেমন তিরতির করে কাঁপছে। পিছনের খুঁটিটায় হেলান দিয়ে ধানুয়া আবার শুরু করল:

ওয়াংদি দাদু, তখনকার দিনে বড় কঠোর ছিল টোটোদের জীবনযাত্রা। জঙ্গলের পর জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বসবাস করার কঠিন জীবন। স্থায়িত্ব নিশ্চয়তা কিছু ছিলনা। অর্থ, সম্পত্তি এসবের বালাই ছিল না। জীবন ও জীবিকার জন্য প্রতি মুহূর্তের লড়াই। জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে, রোগব্যাধি থেকে বাঁচার লড়াই। কে মরল, কে বাঁচল, সে হিসাব রাখারও অবকাশ নেই। যাই হোক, সেদিন টোটোজাতির শিকারিরা সারাদিন শিকার না পেয়ে খুব হতাশ হল। দিনের শেষে একটা বড় গাছের তলায় বিশ্রামের জন্য জড়ো হল। যে যার মতো একটু গা এলিয়ে নিল। দলের বয়স্ক শিকারি বলল, আজ সারাদিন বিফলে গেল। সেই বয়স্ক শিকারির নাম ছিল নাপুনশে। সবাই তার দিকে ফিরে চাইল। নাপুনশে ধীরে ধীরে বলে চলল— খালি হাতে ঘরে ফিরে কী হবে! আমরা রাতজুড়ে শিকারের আয়োজন করি। এইখানে প্রচুর বহেরা গাছ, আমলকি গাছও প্রচুর, সব গাছে ফল ধরেছে অনেক। রাতে অবশ্যই কোনও না কোনও প্রাণী ফল খেতে আসবে। গাছে মাচা বাঁধো। মাচায় উঠে চুপচাপ বসে অপেক্ষা কর। কোনও না কোনও জন্তু নিশ্চয়ই আসবে, বিষমাখানো তির ছুঁড়ে তাকে শিকার করা যাবে।

ওয়াংদির কৌতূহল আরও বেড়ে উঠেছে। সে বলে উঠল, জঙ্গলে রাতে তো কিছুই দেখা যায় না, শিকার করবে কী করে?

ধানুয়া বলল:

হ্যাঁ ওয়াংদি দাদু, অন্ধকার বলে অন্ধকার! আমাদের আজকের সবচেয়ে ঘন জঙ্গলের চেয়েও তখনকার জঙ্গল আরও ঘন। অন্ধকার নামলে তা যেন পুদুয়া পাহাড়ের মতো ভারী হয়ে নামে, তা ঠেলে নড়াচড়াও যেন দুঃসাধ্য। অন্তহীন ঘন কালো চারদিকে, সবকিছু তাতে মুছে গেছে, কেবল মুছে যাওয়া বস্তুদের স্মৃতি যেন অস্পষ্ট শব্দ হয়ে ফিসফিস করে বেড়াচ্ছে। সেই রাতে

বন্য জন্তু সত্যিই এল, কিন্তু টোটো শিকারিরা কেউ তাকে দেখতে পেলনা, কেবল পায়ের আওয়াজ শুনল। সে আওয়াজ শুনে যখন মনে হল যে জন্তুটা বেশ কাছাকাছি এসেছে, তারা সে আওয়াজ লক্ষ্য করে বিষমাখা তির ছুঁড়ল। ভোরের আলো ফুটলে মাচা থেকে নেমে শিকার হওয়া জন্তু থেকে যে যার মতো মাংস ভাগ করে রাখল। জন্তুর মাথা মোড়লের ভাগে। আর এক ভাগ পুরোহিতের জন্য। খিদের জ্বালায় কিছু মাংস পুড়িয়ে নিজেরা খেল। তারপর বয়স্ক নাপুনশে টোটো বলল, চল এবার শিকার নিয়ে ঘরে ফেরা যাক। তখন আলো বেশ ভালোরকম ফুটেছে। নাপুনশে তার মাংসের ভাগ তুলতে শিকারের কাছে গিয়ে চমকে উঠল— একি! এ জন্তু দেখছি অন্যরকম। ভোররাতে মনে হয়েছিল সম্বর কি নীলগাই, এখন তো দেখছি এ অন্যরকম। বাকিরাও ভালো করে দেখে বলল, হ্যাঁ এ তো অন্যরকম জন্তু। বয়স্ক শিকারি ভালো করে দেখে বলল, হ্যাঁ, এ হল লিনও।

ধানুয়া বলে চলে:

টোটোভাষায় আমরা বলি লিনও, এদের অন্যরা মিথুন বা বাইসনও বলে। বয়স্ক শিকারি নাপুনশে বলল, লিনও তো আমরা মারি না, অন্ধকারে শিকার করতে গিয়ে এ অঘটন ঘটে গেল। শিকারির দল গ্রামে ফিরল, সবার ঘরে মাংস বিতরণ হল। তারপর মোড়ল ও পুরোহিতের কাছে গিয়ে এই অঘটনের কথা স্বীকার করল শিকারিরা। মোড়ল ও পুরোহিত আলোচনা করে বলল, খিদে মেটাতে আমাদের বন্য জন্তু মারতে হয়, না মেরে আমরা পারি না, মারতে গিয়ে বন্য জন্তু বাছতে ভুল হয়ে যেতে পারে, তার জন্য শিকারিদের কোনও দোষ দেওয়া যায়না, বিশেষ করে যখন এ রাতের বেলার না দেখে শিকার।

ইউয়ের বাটিগুলো ভরেছে আবার নিঃশেষও হয়েছে বেশ কয়েকবার। দিনের আলো নিভে এসে অন্ধকার নামছে। টোটোপাড়া বাজারের পাশের এই চালাটি যেন দূর অতীত এক সময়ে বাঁধা পড়েছে। ইউয়ের খালি কলসি, বাটি আর ছাঁকনি কাপড় ধুয়ে ঘরে ফেরা মুলতুবি করে মাসি ও তার মেয়েও ধানুয়াকে ঘিরে বসা মানুষগুলোর পাশে এসে বসেছে। ধানুয়ার কথা শুনছে। ধানুয়ার স্বর খাদে নেমে গভীর হয়েছে। ফাঁকা হয়ে আসা বাজারের নিস্তব্ধতা পুদুয়া পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা বাতাসের গোঙানিতে কাঁপছে। ধানুয়া বলছে:

সেই জঙ্গলের পাশে ছিল কোচ রাজাদের রাজ্যের সীমানা। কোচ রাজার কানে খবর পৌঁছল যে সীমানাপারের জঙ্গলে একদল টোটোজাতির মানুষ এসে বাস করছে। জঙ্গল জুড়ে তারা শিকার করছে। সব জন্তু তারা মেরে ফেলছে, এমনকি মিথুনদেরও রেহাই দিচ্ছে না। এবার তারা আমাদের গরুগুলোকেও মেরে ফেলবে। এসব শুনে রাজা তো রেগে লাল। রাজা বলল, গরু শিকার করা মহা পাপ, টোটোদের এখনই তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সে তার প্রহরীদের পাঠাল। প্রহরীরা জঙ্গলে এসে টোটোদের মোড়লকে ডেকে বলল যে এক সপ্তাহের মধ্যে টোটোদের এ জঙ্গল ছেড়ে চলে যেতে হবে, নইলে মরতে হবে। টোটো মোড়ল অনেকভাবে বলার চেষ্টা করল যে টোটোরা মিথুন বা গরু মারে না, রাতের শিকারে অজান্তে একদিন কেবল মেরে ফেলেছে। কিন্তু প্রহরীরা সে কোনও কথাই শুনতে বা বুঝতে চাইল না। রাজার হুকুম শুনিয়েই তারা চলে গেল এক সপ্তাহ পর অস্ত্র-শস্ত্র-হাতি-পাইক নিয়ে হামলা করার হুমকি দিয়ে। টোটো মোড়ল, পুরোহিত আর বয়স্কজনেরা বসে আলোচনা করল, অন্য সবার সঙ্গেও কথা বলল, তাতে সিদ্ধান্ত হল যে টোটোরা এই জায়গা ছেড়ে চলে যাবে, নতুন বাসের জায়গা খুঁজে নেবে। সেই অনুযায়ী কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে টোটোরা আবার ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ করতে করতে উত্তরের দিকে ফিরতে লাগল। কিন্তু জঙ্গল যেন ক্রমশ ঘন থেকে আরো ঘন হয়ে উঠছে। সেই জঙ্গল ঠেলে কিছুটা এগিয়ে মাচা বেঁধে অস্থায়ী ছাউনি করে কিছুটা বিশ্রাম, গাছের ফল-মূল-শিকড় সংগ্রহ করে পেটের জ্বালা মিটিয়ে শরীরে বল ফিরিয়ে আনা, আবার জঙ্গল ঠেলে চলা শুরু। শিশু বা বয়স্ক, নারী বা পুরুষ অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল, বয়স্কজনেরা ওষধি লতাপাতার সন্ধান করে তাদের চিকিৎসা করলেন, কেউ সেরে উঠল, কেউ প্রাণ হারাল। মৃতজনেদের জঙ্গলের মধ্যেই কবর দিয়ে বাকিরা আবার জঙ্গল ঠেলে চলল। বহু আপনজনকে হারানোর বেদনা টোটোদের পাগুলোকে যেন আরও ভারী করে তুলছিল। তবু এই দুর্গম জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ পেরিয়ে টোটোদের প্রথম দলটা একদিন আবার সাতি নদীর তীরে জেদে নামের জায়গায় এসে পৌঁছল। এককালে এখানেই টোটোরা বাস করত, এখান থেকেই তারা পূবদিকে যাত্রা শুরু করেছিল। এই প্রথম দলে ছিল টোটোসমাজের মোড়ল আর পুরোহিত। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে আপাতত এখানেই আবার টোটোরা বসত তৈরি করবে।

ওয়ানচু টোটো বলে ওঠে, আর অন্য দলগুলোর কী হল ধানুয়াকাকু?

সে কথা আবার অন্যদিন হবে, এই বলে ধানুয়া উঠে দাঁড়ায়। চম্পাকলি এখন তাকে ডাকছে। অন্ধকার পথে তার অভ্যস্ত পা নিজে থেকেই চলতে থাকে। হাউড়ির জলের শব্দ ভেসে আসে। ওদিকের কোন ঝর্ণার সঙ্গে যেন আলাপ চলছে। গাছ, পাথর ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ধানুয়া চম্পাকলির কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা পাথরের উপর বসে পড়ে। তার মনে এখন একটা সুর বাজছে। চম্পাকলিই আজ তার জন্য পাঠিয়েছে এই সুর। আজ নিশ্চয়ই ঘুমের মধ্যে চম্পাকলি তার কাছে আসবে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে ধানুয়া ঘরের দিকে পা বাড়ায়। খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়বে। চম্পাকলি আসবে যে!

রোদটা এখন মিঠে। মাঝে মাঝে মেঘের ছায়াও ভেসে আসছে। ধানুয়া আর তার শ্রোতার দল আজ বসেছে ভুটান সীমান্তে সীমানার পাহাড়ের উপর খোলা জায়গায়। জঙ্গলের ঢল সীমান্ত পেরিয়ে নেমে গেছে ওই যে নদীর দিকে তার পাশ দিয়ে ঘন্টাখানেক হাঁটলেই জেদে পৌঁছানো যায়। সেখানকার মানুষজন এখনও প্রতি মঙ্গলবার এই পথেই হেঁটে টোটোপাড়ার হাটে যাতায়াত করে। জলের চকমকি ফিতের মতো নদীটা চিকচিক করছে। পাহাড়গুলো কোথাও রোদে মুখ তুলে হাসছে, কোথাও ছায়ায় ডুবে ধ্যানস্থ। ধানুয়ার চোখ তাদের মধ্যে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওয়ানচু টোটো যেন ধানুয়ার সেই ধ্যান ভাঙাতেই প্রশ্ন করল, ধানুয়া কাকু, প্রথম দল তো জেদে পৌঁছাল, বাকিদের কী হল এবার বল।

ধানুয়া তার শ্রোতাদের মাঝে ফিরে এসে বলতে শুরু করল:

দ্বিতীয় দল প্রথম দলের পথ অনুসরণ করেই আসছিল। প্রথম দল জঙ্গল কেটে পথ করতে করতে এগোনোর সময় কলাগাছ কেটে চিহ্ন রাখতে রাখতে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় দল সেই চিহ্ন দেখে দেখে এগোচ্ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দলের বেশ অনেকজন একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাদের একবার যাত্রা থামাতে হল। লতাপাতার ওষধি দিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে বেশিরভাগের সুস্থ হতে বেশ কয়েকদিন লাগল। যারা মারা গেল তাদের কবর দেওয়া হল সেখানেই। তারপর আবার তারা যখন যাত্রা শুরু করল, কিছুটা এগিয়ে তারা আর প্রথম দলের রেখে যাওয়া চিহ্ন খুঁজে পেলনা। আসলে প্রথম দল যে কলাগাছ কেটে রেখে গিয়েছিল, এতদিনে তা থেকে অনেক কচিগাছের চেড়

হয়েছে। জংলিলতা, যাকে আমরা বড়েদি বলি, তাও কালো হয়ে ছেয়েছে। ফলে দ্বিতীয় দল আর প্রথম দলের যাওয়া রাস্তা খুঁজে পেলনা। রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে নিজেদের মতো চলতে চলতে তারা যে কোথায় গেল, কতজন প্রাণ হারাল, কতজনই বা অন্য জনজাতিদের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেদের ভাষা, নিজেদের আত্মপরিচয় সব হারিয়ে বসল, তার আর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি।

নরবু টোটো বলল, ধানুয়া দাদু, তুমি আমাদের টোটোজাতির যে ইতিহাস বলছ, তাও যদি না লিখে রাখা হয়, তাহলে একদিন এরও তো কেউ হদিশ পাবেনা।

ধানুয়ার মুখে দুঃখ-মেশা হাসি ভেসে ওঠে, সে বলে:

আমাদের টোটোজাতির তো লেখার চল ছিল না দাদু। মুখে মুখে গল্প বলে আমরা আমাদের ইতিহাস বয়ে নিয়ে এসেছি। আজ লেখাপড়ার চল হয়েছে, তোদের মতো ছোট দাদুদেরই তো এ কাজ করতে হবে। নইলে আর কে করবে বল? ইস্কুলে পড়ানো ইতিহাস যারা লেখে তারা তো সব ইংরেজ-ওলন্দাজ নবাব-সম্রাটদের ইতিহাস লিখবে, আমাদের মতো জনজাতিদের কথার সেখানে কোনও স্থানই নেই। অথচ আমাদের ইতিহাস না সম্মান পেলে আমরাও মানুষ হিসাবে সম্মান পাব না। যত পয়সাই রোজগার কর, যত টাকা জমিয়েই পাহাড় কর, যতই পাকা বাড়ি কর, যতই না গাড়ি হাঁকাও, তোমার ইতিহাস যদি তুমি ভুলে যাও জগৎদরবারে তুমি ভিখারিই হয়ে থাকবে। এই ডুয়ার্স অঞ্চল জুড়ে মাটির তলায় আমাদের ঠাকুরদাদা ঠাকুরমাদের কত কবর ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের এক কবির লেখা পড়েছিলাম—

এইখানে আছে তোর আব্বাজান
চিরতরে ঘুমে কবরে...

নরবু দাদু আমাদের ঠাকুরদারাও পাহাড়ে জঙ্গলে নিজেদের মতো করে নিজেদের সম্মান নিয়ে বাঁচতে চেয়ে প্রাণপাত করে গেছে। তাদের চিরঘুমের কবরের পাশে তাদেরই মতো সম্মান নিয়ে দাঁড়ানোর শক্তি যেন সেংজা দেবতা তোদের দেয়। আমাদের দিন তো শেষ হয়ে এল।

ওয়াংদি বলে, টোটোজাতি আবার জেদেয় ফিরল, সে কতদিন আগের কথা, ধানুয়া কাকু?

ধানুয়া বলে:

এ ১৮০০ শতকের আগের ঘটনা, প্রায় আড়াই শো বছর আগে। জেপ্ঞু বা জেদে-তে বসত গড়ার পর টোটোজাতি ডয়াজাতির সঙ্গে রক্তাক্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। দুই জাতিরই বহু মানুষ হতাহত হয়। টোটোজাতির যারা বেঁচে ছিল তারা জেপ্ঞু বা জেদে ছেড়ে আবার পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু করে। সুখে, দাংতি, পুরবে, জিতি ইত্যাদি নদী-ঝোরা পেরিয়ে আমাদের এই এখনকার বসতির জায়গায় আসে। টোটোজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠী এখানে নিজেদের বসত গড়তে শুরু করে। গুয়াটি ঝোরার পাশে বৌদুবি গোষ্ঠী তাদের পাড়া স্থাপন করে, এখন সে পাড়ার নাম ধুমসি গাঁও। নিতেন ঝোরার পাশে বুদুবে গোষ্ঠী পাড়া স্থাপন করে, এখন তার নাম পুজা গাঁও। নিতেনতি উঁচু টিলার উপরে বোঙ্গবে গোষ্ঠী পাড়া তৈরি করে, এখন আমরা সে পাড়াকে মিত্রং গাঁও বলি। চুয়াতি নদী পেরিয়ে ধেরিন চাংকোবি, নুডরিং চাংকোবি, মাত্রবি, রেফাইজিবি, নুবেবি, মাংচিএবি এমন অনেক গোষ্ঠী মিলে পাড়া তৈরি করে, তাদের নেতৃত্বে ছিল টোটো কাইজি অর্থাৎ প্রধান পুরোহিত। বর্তমানে সেই পাড়ার নাম সুব্বা পাড়া। দিনতি পেরিয়ে এপারে টোটো মোড়লের নেতৃত্বে দাংকোবি গোষ্ঠী আর সামান্য কয়েকটি দাংত্রবি গোষ্ঠী, নুবেবি গোষ্ঠীর পরিবার বসতি স্থাপন করে। এখন তা মণ্ডল গাঁও নামে পরিচিত। দাতেনতি নদী পেরিয়ে টোটোদের পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে দানকোবি, দাংত্রোবি, নুবেবি গোষ্ঠী জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করে, বর্তমানে তার নাম পঞ্চায়েত পাড়া। পাহাড়-জঙ্গল-নদী-ঝোরার মাঝে সেই মানুষরাই এই বাসখণ্ডটি তৈরি করে জীবনযাপনের পথ দেখিয়েছিল, সেংজার আশীর্বাদ, জঙ্গল-নদী-ঝোরার আশীর্বাদ এখানে এনে জড়ো করেছিল, আমরা এখন তা ভোগ করছি।

নরবু টোটো বলে ওঠে:

দাদু, আমাদের সেই বড় ঠাকুরদা-ঠাকুরমাদের আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা এই বসতখণ্ডটি তৈরি না করলে হয়ত আমাদের বাপ-ঠাকুরদারা জন্মাত না, আমরাও পৃথিবীর আলো দেখতাম না, টোটোজাতির সবাই হয়ত জঙ্গলে ঘুরে মারা যেত বা অন্য জাতির মধ্যে মিশে পরিচয় হারাত। দাদু, একথা আমি আর কোনওদিন এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারব না। কিন্তু দাদু তোমার মুখেই একথা প্রথম শুনলাম, টোটোপাড়ায় অন্যদের মুখে একথা শুনিনা কেন?

ধানুয়া হাত বাড়িয়ে নরবুকে জড়িয়ে ধরে আদর করল খানিক, তারপর ঝুঁকে পড়ে নিজের মাথাটা নরবুর কাঁধের উপর রাখল। ধানুয়ার মাথা কি বহুদিনের জমে ওঠা ক্লান্তির ভার এই আশ্রয়ে নামিয়ে রাখতে চাইছে নাকি ধানুয়া তার মুখ আড়াল করছে? কারণ, বুকের ভিতরের কোন গহন ঝোরা থেকে জল উছলে উঠেছে তার দুই চোখে, তার দুই চোখ যে ভেসে যাচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত পর ধানুয়া মুখ তুলে যখন সোজা হল, তার মুখের ভাঁজগুলো বৃষ্টিভেজা মাটির মতো দেখায়। তার ঠোঁট নড়ে উঠল, ধানুয়া বলছে:

নরবু দাদু, আর কেউ না বলুক তোদের বলতে হবে। আর সবাই ভুলে যাক তোদের বুকের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে হবে। টোটোজাতি নইলে থাকবে না। অনেকে তো এখন টোটো পরিচয় দিতে লজ্জা পাচ্ছেরে দাদু, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভাষা কোনওটাই তাদের পছন্দ হচ্ছে না, বাবু সাজতে চাইছে তারা। টোটোজাতির সমাজে বড় হয়েও তারা সে সমাজকে ভেঙেচুরে তোরসার জলে ভাসিয়ে দিতে চাইছে। ইংরেজি বুলি কপচাচ্ছে। সরকারের কর্তা দেখলেই মাছির মত ভিড় করছে। সরকারি অনুদান-কমিশন সব লাভের গুড় পিঁপড়ের মতো খাচ্ছে। আর সমাজের বাকি সবাইকে বঞ্চিত করে, বাকি সবাইকে দূরে ঠেলে বাবুদের অনুকরণ করা ভাঁড় হয়ে উঠছে। সরকারি বাবুরাও খুশি এমন ভাঁড় মোসায়েব পেয়ে।

আকাশে মেঘের ভার বেড়েছে। আলো মলিন হয়ে আঁধারের ছায়া ঘনাচ্ছে। বাতাসে ভেসে নামল হালকা বৃষ্টির ছাঁট। বৃষ্টি হয়ত আরো ভারী হয়ে নামতে চলেছে। ধানুয়া আর তার তরুণ শ্রোতারা খোলা জায়গা ছেড়ে ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

আজ ধানুয়া আর তার শ্রোতার দল বসেছে দেমসায়, দেমসার চালায় চিগাইসু আর মুগাইসু– পুরুষ আর নারী ঢোলক যেখানে ঝোলানো, তার নিচে। এখানে বসার আগে আজ ধানুয়া তার তরুণ শ্রোতাদের নিয়ে টোটোদের বিভিন্ন পাড়ার মাঝের পাহাড়-জঙ্গল ঘুরে বহু পুরানো গাছগুলোকে দেখিয়েছে। কোনও কোনও গাছের বয়স তো হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। মূল কাণ্ডকে বেড় দিয়ে কবে নতুন কাণ্ড গজিয়েছিল, মূল কাণ্ড এখন নেই, নতুন কাণ্ডেরও বয়স কয়েক শো বছর হয়ে গেল। আর গ্রামের মধ্যেও আছে বহু পুরাতন কিছু কাঁঠাল গাছ, গ্রামের চেয়ে যারা বয়সে

বড়। এখন এই দেমসায় বসেও সেই গাছগুলো নিয়েই কথা হচ্ছিল। বিকেলের রোদের গায়ে আজ যেন পাকা কাঁঠালের কোয়া-র রঙ লেগেছে। কথার মাঝে ওয়াংসু বলে উঠল:

ধানুয়াকাকু, জেঞ্চু বা জেদে-তে থাকাকালীন টোটোজাতির উপর নাকি বনদেবীর অভিশাপ লেগেছিল? কাইজির কাছে আমি শুনলাম।

ধানুয়া বলল:

আনুমানিক ১৮০০ সালের ঘটনা ওসব। তখন ভুটান-ভারত সীমানার অস্তিত্ব ছিল না। আমরা টোটোজাতির কতজন ছিলাম তাও এখন কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু আমাদের উপর আরো অভিশাপ নেমে এসেছে তো আমাদের এই সময়ে. বনদেবীর থেকে নয়, সরকার আর তার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে। সরকারগুলো সব নিজেদের শাসন-এলাকার সীমানা টেনে সেখানে সেনা-পুলিশের পাহারা বসিয়েছে। তাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টগুলো সব জঙ্গলগুলোকে নিজেদের সম্পত্তি ঘোষণা করেছে। ফলে আজ টোটোরা জেঞ্চু জেদে গেলে তাদের বিদেশি বলা হয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব জঙ্গলে ঘুরে কাইন চাষ করত, ফলমূল-ওষধি সংগ্রহ করত, সেসব জঙ্গলে এখন আমাদের ঢোকা বারণ হয়ে গেছে। বনদেবীকে শিকল পরিয়ে সরকার তার খাজাঞ্চিদপ্তরের পাথরের থামে বেঁধে রেখেছে। বনদেবীর অফুরান দানে টোটোজাতির জীবন লালিত হত, আজ বনদেবী বন্দি, টোটোজাতির জীবনধারাও তাই শুকিয়ে যাচ্ছে। বনদেবীর গা থেকে শৃঙ্খল খুলতে পারলে, জঙ্গলের মধ্যে আমাদের বিচরণের অধিকার সরকারগুলোর টানা সব সীমানার বেড়ি থেকে মুক্ত করতে পারলে, তবেই আমরা টোটোজাতিরা নিজেদের মতো করে বাঁচতে পারব, আমাদের ইতিহাস আমাদের পরম্পরাকে সজীব সতেজ রেখে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু টোটোজাতির মানুষদের মনেও যে ঘুণ ধরেছে, নিজেদের অধিকার ভুলে তারা সরকারের কাছে ভিক্ষাপাত্র বাড়িয়ে ভিক্ষা করতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। তাই তো আমি তোদের আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা শোনাই, তোরা যেন ঘুণধরা মানুষ না হয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো স্বাধীন সবল মানুষ হয়ে উঠিস।

পনের
ভোটের দামামা, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি

সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে দেশে। ভোটের ময়দানে খেলুড়ে পার্টিগুলো কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। কোন নেতা প্রার্থী হবে, ভোটের জোগাড় কোথা থেকে কীভাবে করতে হবে, বিরোধীদের কীভাবে ময়দান-ছাড়া করতে হবে— এসব নিয়ে জোর তোড়জোড়। টোটোপাড়াতেও তার ছাপ এসে পড়েছে। হরেকৃষ্ণবাবু তো বটেই, কখনও সখনও তাঁর পিছু পিছু গেদু টোটো, কাজি তামাঙরাও সদর শহরের বড় পার্টি অফিসে মিটিঙ-ওয়ার্কশপ করতে যাচ্ছে। হরেকৃষ্ণ বাবুই এবারও তাঁর পার্টি থেকে ভোটে দাঁড়াচ্ছেন। এবারও তাঁর জেতা নিয়ে তেমন সংশয় নেই। তবে কিছু অস্বস্তি তৈরি হয়েছে কারণ পার্টির মধ্যেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী নাকি তলেতলে বিরোধী পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। সেই সুবাদে বিরোধী পার্টিও নাকি এবার ভোট দখলের জন্য নরম-গরম নানা উপায় নেওয়ার পাকা ছক কষছে। গেদু টোটো আর কাজি তামাঙ তাই নিজেরা ও তাঁদের লোকলস্কর মারফত টোটোপাড়ার ঘরে ঘরে বলে বেড়াচ্ছে যে ভোট হরেকৃষ্ণবাবুর পার্টির চিহ্নেই ফেলতে হবে, যে অন্য কোথাও ফেলবে পার্টির চোখে সে ঠিক ধরা পড়ে যাবে আর ভোটের পর সরকারি কোনও সাহায্য তো তার মিলবেই না, বরং পার্টি তার হিসেব বুঝে নেবে। এমন মিঠেকড়া হুমকি চোখরাঙানি সব ভোটেই চলে তবে এবার হরেকৃষ্ণবাবুর কিছু অস্বস্তি তৈরি হওয়ায় তার মাত্রাটা বেড়ে গেছে।

চোখরাঙানি যেমন কাউকে বাধ্য করে তোলে, তেমনই কাউকে আরও অবাধ্য করে দেয়। এই দ্বিতীয়টাই হল ওয়াংসু, নরবু, ওয়াংদি, ওয়ানচু, গেঠে-দের মতো তরুণ টোটোদের ক্ষেত্রে। ধানুয়ার কথকতা এদের বুকের

মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল আপন পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি-জীবনচর্যার মাটি থেকে শিকড় আলগা হয়ে যাওয়ার বেদনা, নিজেদের ভাষা হারাতে বসার বেদনা, যে পাহাড়-জঙ্গল-নদী তাদের পূর্বপুরুষদের মায়ের মতো বুকে করে মানুষ করেছে সেই পাহাড়-জঙ্গল-নদীর উপর অধিকার হারানোর বেদনা। কিন্তু তরুণ বয়স কেবল হৃদয় খুঁড়ে বেদনা পুঁতে রাখতে পারে না, তরুণ বয়স তা উগরে দিতে চায়, বেদনা উপড়ে আবার নতুন চাষ করতে চায়। এই তরুণরাও মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিল করার মতো কিছু একটা করতে। নিজেদের ভাষা, নিজেদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য, পাহাড়-জঙ্গল-নদীর মায়ামাখা কোলে নিজেদের মতো করে বাঁচার মতো কিছু করতে। তাই তাদের বুকে হরেকৃষ্ণবাবুর স্যাঙাতদের চোখরাঙানি-হুমকি বাজল বিষমভাবে। যে সরকার টোটোদের চাষজমি-পশু চরানোর জমি কেড়ে নিয়েছে, বনরক্ষী বসিয়ে জঙ্গলে ঢোকা বারণ করেছে, জাপেনদের পাট্টা বিলিয়ে টোটোপাড়াতে টোটোদেরই সংখালঘু করে তুলেছে, সরকারী বাবুদের শাসনের জাল বিছিয়ে টোটোদের পরম্পরাগত সমাজশাসনব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়েছে, চুরি-দুর্নীতির আখড়া গড়ে তুলেছে, সেই সরকারের কলকাঠি নাড়া বাবু চোখ রাঙিয়ে বলছে তার পায়েই মাথা ঠেকিয়ে রাখতে হবে! কোনওভাবেই তা মেনে নেওয়া যায় না!

এই তরুণরা এসে ধানুয়ার কাছে জড়ো হয়। ধানুয়াকে বলে যে ভোটে ওসব পার্টিদের প্রার্থী তারা মানবে না, টোটোদের নিজেদের মধ্য থেকে এমন কাউকে প্রার্থী করতে হবে যে টোটোদের কথা তুলে ধরবে। তারা ধানুয়াকেই প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াতে বলে। ধানুয়া সস্নেহে তাদের পিঠে-মাথায় হাত বোলায়। এদের শিরদাঁড়াটা যে সোজা আছে, মাথাটা যে উঁচু হয়ে আছে, তাতে তার মন খুশিতে ভরে যায়। আবার অভিজ্ঞতার অভাবে এদের সম্ভব-অসম্ভব বোধটাও যে পোক্ত হয়নি তাও বুঝতে পারে। সে তাদের বোঝায় যে টোটোদের নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করানো এই সরকারী বাবুদের ভোটের খেলার নিয়ম অনুযায়ী সম্ভব নয়। বিশাল অঞ্চল জুড়ে ভোটের এই কেন্দ্র, তার মধ্যে টোটোপাড়ার এলাকা কতই না ক্ষুদ্র! এই টোটোপাড়াতেই টোটোরা এখন সংখ্যালঘু, গোটা অঞ্চলের জনসংখ্যার তুলনায় তারা তো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র! হাজারখানেক টোটো ভোটের উপর দাঁড়িয়ে কোনও প্রার্থী জেতা তো দূরের কথা, জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়াও আটকাতে পারবে না। আর তাছাড়া প্রার্থী হতে গেলে, প্রচার করতে গেলে যত টাকা লাগে তাই বা

টোটোরা নিজেরা জোগাড় করবে কী করে? ধানুয়ার যুক্তি শুনতে শুনতে উত্তেজনার আলোতে উজ্জ্বল তরুণ টোটো মুখগুলো নিভে আসে। ধানুয়া তখন আবার উৎসাহ দিয়ে বলে যে মুষড়ে পড়ার কিছু নেই, ভোটের খেলার ময়দানটায় সুবিধে করতে না পারলে কী হয়েছে, অন্যভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচার লড়াই করতে হবে। তরুণদের মুষড়ে পড়া ভাব তবু কাটে না, সন্ধ্যার ঘন হতে থাকা অন্ধকারে তারা ধানুয়ার কাছ থেকে ফিরে যায়।

তরুণরা চলে যাওয়ার পরও ধানুয়া তার বাড়ির বারান্দায় বসে থাকে অন্ধকারের দিকে চেয়ে। তার মনটাও ভারী আর অশান্ত হয়ে উঠেছে। তার প্রিয় এই তরুণগুলোর মনের উৎসাহ, মুখের আলো নিভিয়ে দেওয়ার অপরাধবোধে সে ভোগে, ঘুরে ঘুরে বিচার করতে চায় কোথায় তার ভুল হল। তাও ঠিক ঠাওর করতে পারে না। এভাবে ভাবতে ভাবতে তার নিজের এই বয়সের স্মৃতি মনে ভিড় করে আসে। বছর তিরিশ আগের টোটোপাড়া-লঙ্কাপাড়ার জঙ্গল স্মৃতিতে জেগে ওঠে। হাউড়ির ধার ধরে সেই জঙ্গলে সে কতই না ঘুরেছে। ফল-ফুল-কন্দে ভরা জঙ্গল। পাখির কলতানে ভরা জঙ্গল। বাঘ, হাতি, গণ্ডার, বনশুয়োরের অবাধ বিচরণভূমি সেই জঙ্গল। পুরানো এক দিনের কথা স্মৃতির কোন কোটর থেকে হঠাৎ সামনে উঠে এল। রন্নে দাদা আর জেঠামশাই কালুরামের সঙ্গে সে গিয়েছিল জঙ্গল-সংগ্রহের কাজে। রন্নে দাদার সঙ্গে তার দায়িত্ব ছিল ভাঙা ডালপালার কাঠ আর গরুর খাওয়ার লতাপাতা সংগ্রহ করা। কালুরাম জেঠা শাক-সবজি, জংলী পানপাতা, জঙলী ছত্রাক, কন্দ সংগ্রহ করছিল। রন্নে দাদা আর ধানুয়া নজর করে শিখছিল কোথায় কী পাওয়া যায়, কোথায় মাটি খুঁড়লে আলু বা কন্দ মেলে। হঠাৎ কালুরাম জেঠা চিৎকার করে উঠল: ভাগ, ভাগ, গণ্ডার আসছে...। সামনের একটা লম্বা গাছ দেখিয়ে তাদের তাড়াতাড়ি সেই গাছ বেয়ে উঠে পড়তে বলল। ধানুয়া ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রন্নে দাদা ধানুয়ার পিঠ থেকে একটানে ঝুড়িটা খুলে নামিয়ে রেখে বলল: আমার ঘাড়ে উঠে পড় শিগগিরি...। ধানুয়া একলাফে রন্নে দাদার ঘাড়ে উঠে পড়ল। ধানুয়াকে ঘাড়ে করে রন্নে দাদা পলকের মধ্যেই গাছ বেয়ে উঁচু একটা ডালে উঠে বসল। কালুরাম জেঠাও আর একটা গাছে তখন উঠে পড়েছে। জঙ্গল ভেঙে ঝড়ের মতো গণ্ডারটা ছুটে বেরিয়ে গেল। খানিক্ষণ পর আবার তারা নেমে এল। চন্দ্রামামার কথাও মনে পড়ে। চন্দ্রামামা ছিল মৌচাক খুঁজে তার থেকে মধু সংগ্রহ করতে ওস্তাদ।

কত মধু চন্দ্রামামা সংগ্রহ করে খাইয়েছে। কিন্তু ছোটমামা হরকা চন্দ্রামামার দেখাদেখি মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে কী বিপদেই না পড়েছিল! মৌমাছির কামড়ে অসুস্থ হয়ে বেশ কিছুদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। আর রন্নে দাদা ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল জংলী আলু খুঁড়ে সংগ্রহ করার কাজে। মাটির উপরের চেহারা দেখেই রন্নে দাদা বলে দিতে পারত কোথায় খুঁড়লে ভালো আলু পাওয়া যাবে। কতবার রন্নে দাদার সংগ্রহ করা আলু হাউড়ির পাশেই আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিয়ে তারা খেয়েছে। পরবর্তীকালে বিয়ে হওয়ার পর বউ চম্পাকলিকে নিয়েও ধানুয়া এই জঙ্গলের মধ্যে কত সময় কাটিয়েছে। চম্পাকলি এক বিশেষ ধরনের ছত্রাক খেতে খুব ভালোবাসত আর সেই ছত্রাক জঙ্গলের কোথায় পাওয়া যাবে তা ধানুয়ার চেয়ে ভালো আর কেউ জানত না। জঙ্গলে খাদ্যের কোনও অভাব ছিল না। জন্তুর খাদ্যই বল আর মানুষের খাদ্যই বল— সবই ছিল অঢেল। চৈত্রমাসে খরার সময়টাও এই জঙ্গলের খাদ্যই টোটোপাড়া আর লঙ্কাপাড়ার আদিবাসীদের বাঁচিয়ে রাখত। জন্তু আর মানুষরাও ছিল প্রতিবেশীর মতো— জঙ্গলের খাদ্যের ভাগ নিয়ে, অধিকার নিয়ে তাদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা বা কাড়াকাড়ি ছিল না। মায়ের বুকের দুধ নিয়ে কি শিশুরা কখনও কাড়াকাড়ি করে! একে অপরের প্রয়োজনের জন্য জায়গা করে দিয়ে, জায়গা ছেড়ে দিয়ে জন্তু ও মানুষরা পাশাপাশি বাঁচত একই মায়ের সন্তানদের মতো।

সেই মানুষরা আজ বেশিরভাগই মরে গেছে, আর তার চেয়েও দুঃখের কথা যে মায়ের মতো জঙ্গলটার কী দুরবস্থা হয়েছে এই সরকারি বাবুদের দৌড়াত্মে! সরকারি বাবুদের চোখে জঙ্গল মায়ামমতা-ভরা মায়ের কোল নয়, তারা জঙ্গলকে চেনে না, বোঝে না। তাই তাদের কাছে জঙ্গল মানে ভয়, জঙ্গল মানে জন্তুর আক্রমণে প্রাণ হারানোর আশঙ্কা, জঙ্গল মানে জীবনধারণের পথে বাধা, জঙ্গল মানে দারিদ্র্য-অনুন্নতি। জঙ্গলের সঙ্গে পরিচিত না হয়েই তারা দূর থেকে তাদের এই ভুল ধারণা গড়ে তুলেছে আর অন্ধ গর্বে মত্ত হয়ে সেই ধারণাকেই একমাত্র সঠিক বৈজ্ঞানিক ধারণা বলে কথায়-বার্তায়-শিক্ষা-দীক্ষায় প্রচার করছে। এই ভুল ধারণার জন্যই তারা কেবল জঙ্গল কেটে ফাঁকা করে দিতে চায়। কয়েক হাজার বছরের পুরানো গাছকে যন্ত্র-করাতে কেটে কয়েক ঘন্টায় চেরা-কাঠে পরিণত করে। জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে শহর-গঞ্জ-বাজার বসায়। আর ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত জঙ্গলের এক টুকরোকে পিচঢালা পথ, টাওয়ার, বনবাংলো আর বন্দুকধারী

পাহারাদারের জালে ঘিরে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলে— যেখানে ওই বাবুসমাজের লোকেরা পর্যটন করতে এসে জঙ্গলের আসল রূপের দিকে পিছন ফিরে বসে অঢেল মদ-মাংস-ফুর্তির বেহায়াপনা চালায়। একেই তারা নাম দিয়েছে 'উন্নয়ন'। তাদের এই জঙ্গল-ধ্বংসের নাম উন্নয়ন, জঙ্গল-মায়ের কোল থেকে আদিবাসী মানুষ ও জন্তুদের ঠাঁইছাড়া করার নাম উন্নয়ন।

এই উন্নয়নের ফলেই তো জঙ্গলের সন্তান টোটোরা ক্রমশ নিঃস্ব হচ্ছে। চারদিকের জঙ্গল ক্রমশ ফিকে হচ্ছে, জন্তুরা বাসভূমি হারিয়ে মারা পড়ছে নয়ত নিষ্ফল আক্রোশে লোকালয়ে এসে হানা দিচ্ছে। ফরেস্ট-গার্ডরা একদিকে আড়ালে চোরাকারবারিদের জঙ্গল ফাঁক করে দেওয়ার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে আর অন্যদিকে টোটোদের বন্দুক উঁচিয়ে হুমকি দিচ্ছে যে জঙ্গলে ঢোকা যাবে না, জঙ্গল থেকে কিছু সংগ্রহ করা যাবে না। জংলী ফল-মূল-কন্দ-ছত্রাক বেশিরভাগই আর এখন টোটোরা সংগ্রহ করতে পারে না, এখনকার তরুণ-তরুণীরা সেসব চেনেও না। বাজার থেকে শুকনো ফল, কৃত্রিম পদ্ধতিতে গজানো ছত্রাক কিনতে হয়, তার দামও দিনের পর দিন বাড়তেই থাকে, ফলে তাও সবাই কিনতে পারে না, সবসময় কিনতে পারে না।

জঙ্গলের কোলে বাঁচার সময় টোটোদের কোনও অভাব বোধ করতে হয়নি, আজ অভাববোধ তাকে বেঁধে ফেলছে আষ্টেপৃষ্ঠে। আর এর উপর আছে অপমান, নিজের বাসভূমিতেই সংখ্যালঘু হয়ে ওঠার অপমান, নিজের ভাষাকে সবকাজে ব্যবহার না করতে পারার অপমান।

তরুণ ধানুয়ার তুলনায় আজকের তার প্রিয় তরুণরা তাই সারাক্ষণ জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে। কীভাবে তাদের এই দহনের উপশম হতে পারে? বারান্দায় বসে অন্ধকারের দিকে চেয়ে ধানুয়া ভাবে আর ভাবে। সহজ কোনও উত্তর এসে ধরা দেয়না।

ভোট-খেলুড়ে মহলে হরেকৃষ্ণবাবুর বিরোধীরা হরেকৃষ্ণ বাবুর বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। তারা প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছে কালচিনি চা-বাগান অঞ্চলের এক নেতা প্রকাশ গোলেকে। ভোট দখলের জন্য নানা হিসাবনিকাশ তারাও কষতে শুরু করেছে। তামাঙ জনজাতির একজনকে প্রার্থী করার মধ্য দিয়ে তারা নেপালিদের ভোট দখল করতে চাইছে।

সেইজন্য গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আরও উত্তরে যারা আন্দোলন করছে তাদের সঙ্গে সমঝোতা-সহায়তার নানা কৌশলও তারা আঁটছে। এই কৌশলীদের কাছে খবর পৌঁছাল যে টোটোপাড়ার টোটো তরুণদের মধ্যে একটা অংশ হরেকৃষ্ণ বাবুর পার্টির চোখরাঙানি মেনে নিতে চাইছে না, ভোটে তাঁর বিরোধিতা করতে চাইছে। এই খবর পাওয়ার পরই এই ভোট-খেলুড়ে কৌশলীরা তাদের ছকে এই টোটো তরুণদের বোড়ে হিসেবে সামিল করার জন্য উঠেপড়ে লাগল।

হ্যামিলটন গঞ্জের মেলায় ওয়াংসু, নরবু, ওয়াংদি-রা দলবল বেঁধে হাজির হয়েছিল মাঝ-বিকেলেই। বরাবরের মতো এবারও সারা রাত মেলায় ঘোরার পরিকল্পনা ছিল তাদের। সন্ধ্যা গড়িয়ে যখন শেষবেলায়, তখন তাদেরই বয়সী টোটোপাড়ার মঙ্গর গাঁওয়ের তামাঙ তরুণ প্রতাপ লামা তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। কথায় কথায় সে বলে প্রকাশ গোলের পার্টির লোকেরা তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। কী নিয়ে কথা বলতে চায়? হরেকৃষ্ণ বাবুর পার্টির অত্যাচার শেষ করা নিয়ে কথা বলতে চায়। ওয়াংসু, নরবু, ওয়াংদিরা বুঝে উঠতে পারে না কী করবে। ধানুয়াও তো এখন কাছে নেই যে পরামর্শ নিয়ে আসবে। ধানুয়ার সঙ্গে শেষ কথা হওয়ার পর তাদের মনটা কিছু না করতে পারার অসহায়তাবোধে কেমন অসাড় হয়ে ছিল, এখন যেন আবার আশা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কিন্তু আবার সংশয়ও কাটে না। হরেকৃষ্ণ বাবুর পার্টির বিরোধী হলেও প্রকাশ গোলের পার্টিও হাঁকডাক-ছড়ি ঘোরানোরই কারবারি। চা-বাগানের কুলি-মজুরদের মধ্যে তাদেরও চুরি-দুর্নীতি আর চোখ-রাঙানির কারবারের নানা কথা ঘুরে বেড়ায়। ওয়াংসুদের মনের টানাপোড়েন খেয়াল করে প্রতাপ লামা বেশ জোরের সঙ্গে বলে:
আরে এত ভাবার কী আছে? কটা কথা বলবি বৈ তো আর কিছু নয়। তোদের দিয়ে তো কেউ জোর করে কিছু করিয়ে নিচ্ছে না। আর তোদের তো অন্য কোথাও যেতেও হবে না। এই মেলার মধ্যেই সব বাতচিত হবে।

ওয়াংসুরা রাজি হয়ে যায়। ওয়াংসু, ওয়াংদি আর নরবু তাদের মেলা-ঘোরার দলের থেকে ইচ্ছে করেই আলাদা হয়ে পড়ে। তারপর প্রতাপ লামা তাদের নিয়ে যায় মেলা-মাঠের মাঝে একটা বড় শামিয়ানার নিচে সাজিয়ে বসা চপ-কাটলেট-নুডলস-য়ের দোকানে। একধারে রান্নার জায়গা, আরেক ধারে ত্রিপল দিয়ে ঘিরে কয়েকটা কেবিন-গোছের খুপরি— আড়াল রেখে

যারা খাওয়া-দাওয়া করতে চায় তাদের জন্য আর মাঝখানের বড় জায়গাটায় প্লাস্টিকের টেবিল-চেয়ার গা-ঘেঁষাঘেষি করে পাতা সাধারণ খাইয়েদের জন্য। প্রতিটা টেবিলই ভর্তি। অনেকে পাশে দাঁড়িয়ে বসার সুযোগের অপেক্ষা করছে। দশ থেকে পনের বছর বয়সের মধ্যে বয়স হবে এমন মলিন চেহারার পাঁচটা ছেলে টেবিলগুলোর মধ্যে ছুটে বেরিয়ে অর্ডার নিচ্ছে, খাবার এনে দিচ্ছে। কেতাদুরস্ত পোষাক পরা মাঝবয়সী একজন ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ তদারক করছে, খাওয়ার দাম সংগ্রহ করছে আর খাওয়া-শেষ-করা ক্রেতাদের টেবিল ছাড়তে তাড়া দিচ্ছে। শামিয়ানার মাঝখানের খুঁটিতে বাঁধা একটা সাউন্ডবক্স থেকে দ্রুতলয়ের নাচের তালের জনপ্রিয় সঙ্গীত ছড়িয়ে পড়ছে। তার তালে কেউ কেউ গলাও মিলিয়ে দিচ্ছে মাঝেমধ্যে, কারও কারও পায়ে বা কোমরে লেগে যাচ্ছে সেই নাচের ছন্দের দোল। আর সবকিছুর পিছনে হাজারও গলার হরেক ভাষার গুঞ্জন একসঙ্গে মিশে গিয়ে ঢেউয়ের মতো উঠছে পড়ছে। প্রতাপ লামা ওয়াংসুদের তিনজনকে এককোণে দাঁড় করিয়ে কেতাদুরস্ত পোষাক পরা লোকটির সঙ্গে গিয়ে কীসব কথা বলে আসে, লোকটি ঘাড় নেড়ে একটা ত্রিপল-ঘেরা খোপের দিকে দেখিয়ে দেয়। প্রতাপ লামা ফিরে এসে ওয়াংসুদের নিয়ে সেই খোপের দিকে এগিয়ে যায়। খোপের দরজার ভারী পর্দা ঠেলে তারা ভিতরে ঢোকে। সব খোপগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড়। একটা প্লাস্টিকের বড় টেবিলকে ঘিরে আটটা চেয়ার। টেবিলের উপর একটা বাল্ব ঝুলছে, তার একদিকে একটা শেড লাগানো। ফলে খোপের একদিকটায় আলো-আঁধারি, অন্যদিকটায় উজ্জ্বল আলো। আলো-আঁধারির দিকটায় দুজন বেশ হোমরাচোমরা ভাবের লোক বসে আছে। তাদের ঘিরে টেবিলের চারদিকে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে নানা বয়সের নানা চেহারার দশ-বারো জন। তারা ওই হোমরাচোমরা দুজনকে নেওয়ারজি আর ভোলাবাবু বলে ডাকছিল, সম্ভ্রমের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। মাদারীহাটের কাছে একটা পাড়ায় জলের কল বসানোর জায়গা নিয়ে ঘটা গণ্ডগোল নিয়ে কথা হচ্ছিল। ভোলাবাবু আর নেওয়ারজিদের বাছাই করা জায়গাটিতেই হরেকৃষ্ণবাবুদের পার্টির বাধা অতিক্রম করে কীভাবে কলটি বসানো যায়, তার জন্য কোন সরকারি-বাবু আর কোন পুলিশ-বাবুকে কীভাবে ম্যানেজ করতে হবে সেই শলাপরামর্শ শেষ হল। সেই নিয়ে কথা বলতে বলতে পাঁচজন বেরিয়ে গেল। টেবিলের উপর রামের গ্লাসটাতে একটা চুমুক দিয়ে নেওয়ারজি প্রতাপ লামার দিকে

তাকালেন। প্রতাপ ওয়াংসুদের দেখিয়ে নেপালি ভাষায় বলল, টোটোদের নিয়ে এসেছি স্যার। নেওয়ারজি আর ভোলাবাবু এবার সরাসরি ওয়াংসুদের তিনজনের দিকে তাকালো। অল্প হাসি, অল্প আগ্রহ ফুটে উঠল মুখে। নেওয়ারজি নেপালিতেই বললেন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রকাশ গোলে সাহেবের সঙ্গে তোমাদের কথাই হচ্ছিল, তোমরা তো হরেকৃষ্ণবাবুদের চোখ-রাঙানি মেনে নিতে চাও নি, তোমাদের মতো সাহসী তরুণদেরই তো দেশের দরকার, বসো বসো, অনেক কথা আছে। ভোলাবাবু ঘরের মধ্য থাকা বাকিদের বললেন, তোরা এখন যা, মেলা ঘুরে দেখ, এদের সঙ্গে কথাটা আমরা সেরে নিই। বাকিরা বেরিয়ে গেল। টেবিলের আলোকিত দিকটায় প্রকাশ, ওয়াংসু, নরবু আর ওয়াংদি বসল। তাদের জন্য শুয়োরের মাংস আর ভুটানি রামের অর্ডার গেল। নেওয়ারজি তাঁর বাবার হাত ধরে সেই কবে প্রথম টোটোপাড়া গিয়েছিলেন সেই গল্প দিয়ে শুরু করলেন...

হ্যামিলটনগঞ্জের মেলার মাঠে নেওয়ারজি আর ভোলাবাবুর সঙ্গে ওয়াংসুদের সেই বৈঠক গভীর রাত অবধি গড়িয়েছিল। হরেকৃষ্ণবাবু, তাঁর পার্টি, গেদু টোটো ও কাজি তামাঙ সহ সব সাঙ্গপাঙ্গরা কত দুর্নীতি করেছে, টোটোপাড়ার উন্নতির জন্য সরকার থেকে বরাদ্দ হওয়া কত টাকা নিজেদের পকেটে ভরেছে, স্বজনপোষণ করেছে বেআইনিভাবে আর তার জন্য টোটোপাড়া উন্নতির মুখ দেখতে পায়নি— তার বিস্তর তালিকা নেওয়ারজি আর ভোলাবাবু বলে যাচ্ছিলেন, ওয়াংসুদের অভিজ্ঞতার সঙ্গেও তা কিছু কিছু মিলে যাচ্ছিল। ফলে ধীরে ধীরে তাঁদের উপর ওয়াংসুদের আস্থা জন্মাচ্ছিল। প্রকাশ গোলে ও তাঁর পার্টি যে এই দুর্নীতির ঘুঘুর বাসা ভাঙার জন্য এবার ভোটে একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে, আর সেজন্য ওয়াংসুদের মতো সাহসী তরুণদেরও তাঁর দরকার একথাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শোনানো হয়েছিল। আর প্রকাশজী জিতলে টোটোপাড়ার ভবিষ্যৎ কীভাবে পাল্টে যাবে তার সোনালী ছবি আঁকা হয়েছিল। টোটোপাড়ার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছ থেকে আরও বরাদ্দ আদায় করা হবে, একটি টাকাও দুর্নীতি-স্বজনপোষণে নষ্ট করা হবে না, মাদারীহাট থেকে টোটোপাড়া অবধি রাস্তা সারিয়ে পাকা সেতু করে বারোমাস অবাধ যান-চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে, বিশেষ পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে টোটোপাড়াকে গড়ে তোলা হবে, টোটো পরিবারদের জন্য মাসিক সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা হবে, তাছাড়া

টোটোরা যাতে হোম-স্টে করে পর্যটকদের রেখে রোজগার করতে পারে তার জন্যও সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে, আর ওয়াংসু-নরবু-ওয়াংদি-র মতো যোগ্য ছেলেরা যাতে সরকারি চাকরি পায় তারও ব্যবস্থা করা হবে। টেবিলের আলো-আঁধারি মাখা দিক থেকে উদ্গত আলো-ঝলসানো ভবিষ্যতের এই পূর্বাভাস ওয়াংসুদের যেন থতমত করে দিয়েছিল, অন্ধকার রাস্তায় জোরালো হেডলাইটের আলো চোখে পড়লে যেমন হয়। তাদের মনের অবিশ্বাস-দোলাচলগুলোও যেন থমকে দাঁড়িয়েছিল। ওয়াংদি টোটো ভাষার দুরবস্থার কথা, টোটো সংস্কৃতির ধারা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসার কথা তুলেছিল। নেওয়ারজি তার কথাকে ফুরোতে না দিয়েই সোৎসাহে বলেছিলেন যে ওসবতো ছোটখাটো সমস্যা, প্রকাশজী জিতলে এক তুড়িতেই তার সমাধান হবে, টোটোদের পুজো-উৎসবের জন্য বিশেষ তহবিল গড়ে দেওয়া হবে, টাকাপয়সার অভাব হবে না, কালচিনির বাৎসরিক আদিবাসী উৎসবে টোটোদের গান-নাচের বিশেষ অনুষ্ঠান রাখা হবে, এমনকি কলকাতা বা দিল্লিতে গিয়েও যাতে টোটো গান-নাচ তারা 'পারফর্ম' করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। নরবু স্কুলে টোটোভাষায় পড়ানো চালু করার কথা বলতে গিয়েছিল। ভোলাবাবু বলেছিলেন, টোটো ভাষায় তোমরা যত খুশি গান কর, নাচ কর, নাটক কর, কিন্তু উন্নতি করতে হলে পড়াশোনাটা তোমাদের ইংরেজির মতো ভাষাতেই করতে হবে, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল যাতে আরো চালু করা যায় তা প্রকাশজী দেখবেন। আগামী উন্নয়নের খতিয়ান আর অঢেল ভুটানি রামের নেশা মিশে ওয়াংসুদের টলোমলো করে দিয়েছিল। শেষ অবধি তাদের বলা হয় যে টোটোপাড়ায় ফিরে তারা যেন লোক বুঝে এসব নিয়ে কথাবার্তা চালায়, বয়স্কদের কাছেও বলে, যারা জড়ো হবে তাদের সঙ্গে একেবারে প্রকাশজীকে নিয়ে তারা আবার বসবে।

টোটোপাড়ায় ফিরে পরের দিন মাঝসকালে ওয়াংসু, ওয়াংদি, নরবু প্রথমে যায় ধানুয়ার সঙ্গে আলোচনা করতে। ওয়ানচু আর গেঠেকেও তারা ডেকে নেয়। বয়স্কদের মধ্যে ধানুয়া নচুয়া, শনে ও বিশুকে ডেকে নিয়েছিল। ধানুয়ার ঘরের বারান্দায় সবাই জড়ো হয়। ওয়াংসি, ওয়াংদি আর নরবু হ্যামিল্টনগঞ্জ মেলার বৈঠকের কথা বিস্তারিতভাবেই সবাইকে বলে। তাদের বলা শেষ হওয়ার পর খানিকক্ষণের নীরবতা নেমে আসে। শনে ও বিশুর

নিয়ে আসা তাদের ঘরে তৈরি ইউ বাটিতে বাটিতে সবার হাতে বিতরণ হয়। নীরবতার মধ্যে ইউয়ের বাটিতে চুমুক দেওয়ার শব্দ জেগে থাকে। তারপর নচুয়ার সংশয়-ভরা গলা শোনা যায়: প্রকাশ গোলের পার্টি কি আদৌ জিততে পারবে, ওদের পক্ষ নিলাম আর ওরা হারল, তারপর হরেকৃষ্ণবাবুদের পার্টি তো আমাদের আরও হয়রান করবে? গেঠে বলে ওঠে: ওইরকম করে ভাবলে তো আর কিছুই করার থাকে না, চুপচাপ বসে থাকতে হয়, যা চলছে সব সয়ে নিতে হয়! ধানুয়া ছাড়া সবাই এক এক করে মুখ খোলে, কেউ বলে এই পক্ষে, কেউ বলে ওই পক্ষে। কোনও পক্ষই অপর পক্ষকে সন্তুষ্ট করে নিজের মতে নিয়ে আসতে পারে না। সন্দেহ-অবিশ্বাসও জেগে থাকে। পার্টির লোকেরা মুখে এখন যা বলছে কাজে তার কতটুকু হবে সে সন্দেহ তো আছেই, আলোচনা চলতে চলতে একে অপরের সম্বন্ধেও নানা সন্দেহ জাগে। একজন সন্দেহ করে যে অপরজন ভয়ে গুটিয়ে থাকতে চাইছে। অপরজন আবার সন্দেহ করে যে না ভেবেচিন্তে উত্তেজনার বশে আরও ক্ষতিই ডেকে আনা হতে চলেছে। এভাবে চলতে চলতে তরুণরা জোর দিয়ে বলতে থাকে যে ঝুঁকি নেওয়া হলেও তা নিতে হবে, প্রকাশজীর পার্টি জিততে না পারলে এখনকার থেকে অবস্থা আর কীই বা বেশি খারাপ হবে, আর প্রকাশজীরা জিতেও যদি উন্নয়ন করার কথা না রাখে, তখন তাদের সেই কথা রাখার জন্য চাপ তৈরি করার নতুন ভাবনা ভাবলেই হবে।

এরপর সবার খেয়াল হয় যে আলোচনা এত গড়িয়ে গেলেও ধানুয়া এখনও মুখ খোলেনি। বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে সবার কথা শুনছে, নানা ভাবনা মেঘের মতো তার মুখের উপর ছায়া ফেলে ঘোরাঘুরি করছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু কী যে সে ভাবছে কথায় প্রকাশ হচ্ছে না। সবাই তাই নিজেদের কথা থামিয়ে ধানুয়ার দিকে চেয়ে বলে: কোনও কথাই যে বলছ না, তুমি কী ভাবছ বল তো!

ধানুয়ার চোখের দৃষ্টির ভাসা-ভাসা ভাবটা কেটে তার সামনের মানুষগুলোর উপর এসে স্থির হয়, ধীরে ধীরে সে বলতে শুরু করে:

নিজের মনের ধন্দই কাটাতে পারি না, তোমাদের আর কী বলব বল দেখি! তোমরা যেভাবে দেখছ আমি তো সেভাবে দেখতেও পারছি না। প্রকাশজীরা উন্নয়নের যে ফিরিস্তি দিয়েছে তা সত্যি হলে তোমরা তো বেশ খুশি হবে মনে হচ্ছে, তাই প্রকাশজীদের পার্টি জিতবে কিনা, জিতে কথা রাখবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা করছ। কিন্তু আমি তো ওই ফিরিস্তিতে খুশি হওয়ার মতো

কিছু দেখছি না। পাকা রাস্তা, পাকা সেতু হয়ে বারো মাস অবাধে গাড়ি চলার রাস্তা হলে কী কী হবে? আমাদের মায়ের মতো জঙ্গল আরও দ্রুত ধ্বংস হবে। গাছ কেটে চেরাই করে লরিতে ভর্তি করে আরও দ্রুত পাচার হবে। আমাদের নদী-পাহাড়ের কী হবে? নদীর বোল্ডার তুলে আরও দ্রুত পাচার হবে। পাহাড়ের গা কেটে পাথর ভেঙে আরও দ্রুত পাচার হবে। জঙ্গল-নদী-পাহাড়কে হত্যা করে টাকা করার এই কারবারে তৃতীয় সারির অংশীদার হিসেবে আমাদের কারও কারও কিছু টাকাও রেজগার হতে পারে, কিন্তু সেই টাকা কি আমাদের সুখের জীবন দিতে পারবে? জঙ্গল-নদী-পাহাড় টোটোদের লালন-পালন করেছে, সেই মায়ের কোল ধ্বংস হয়ে গেলে টোটোরা বাঁচবে কোথায়, বাঁচবে কীভাবে? সরকারি বাবুদের দেওয়া বরাদ্দ আর দাক্ষিণ্যের দিকে চেয়ে থেকে বাঁচবে? সেই বরাদ্দ, সেই দাক্ষিণ্য দিয়ে কী হবে? আরেকটা জঙ্গল, আরেকটা পাহাড়, আরেকটা নদী তৈরি করা যাবে? না, যাবে না। ওসব টাকা দিয়ে তৈরি হয় না। ওসব প্রকৃতির নিজের খেয়ালে হাজার হাজার বছর ধরে তৈরি হয়, আর কেউ আর কোনওভাবে তা তৈরি করতে পারে না, তাই তো আমাদের বাপদাদাদের কাছে আমরা শিখেছি যে এই প্রকৃতিই হল আমাদের ইশ্বর, আমাদের সেংজা। সেই সেংজাকে আমরা ধ্বংস করব আর সরকারি বাবুদের কৃপায় পাওয়া তহবিল দিয়ে বছরে একবার সেংজা পুজোর জাঁকজমক করলে আমাদের ধর্ম রক্ষা হবে কি? হবে না। বাবুরা বলেছেন আমাদের ইংরেজি ভাষায় পড়াশুনা করে উন্নতি করার ব্যবস্থা করবেন, আর টোটো ভাষা থাকবে কেবল ওই বাবুদের বেঁধে দেওয়া মঞ্চে নাচ-গান-নাটক করার জন্য। টোটো শিশুরা তাহলে তাদের বাপদাদাদের ইতিহাস, বাপদাদাদের জড়ো করে বয়ে আনা গাছ-গাছড়া-জীবন সম্পর্কে জ্ঞানগুলো শিখবে কী করে? আর সেগুলো শেখার প্রয়োজন যদি আর না বোধ করি তবে নিজেদের আর বাপ-ঠাকুরদার পরিচয়ে টোটো বলে জাহির করা কেন? সবই তো আমরা জলাঞ্জলি দিয়ে দিলাম, এখন আমাদের ঘরটাকেও জলাঞ্জলি দেব পর্যটকবাবুদের জন্য হোম-স্টে করে তাঁদের খানাপিনা-ফুর্তির আয়োজন করার মধ্য দিয়ে? তোমরা কী এইসবকেই উন্নয়ন ভাবছ? আমি তো ভাবতে পারছি না, তাই তোমাদের কথার মধ্যে কোনও কথা বলারও সাহস পাচ্ছিলাম না। আমাদের বাপদাদারা আমাদের অমুক পার্টি বা তমুক পার্টি বা অমুক-তমুক সরকারের দান-অনুগ্রহের বা করে-দেওয়া–পাইয়ে-দেওয়ার মুখ চেয়ে বাঁচতে শেখায় নি

কারণ সেংজার কাছে, প্রকৃতির কাছে তারা তেমন শিক্ষা পায়নি। তারা জঙ্গল-নদী-পাহাড়ের মাতৃকোলে অন্যান্য জীবজন্তুদের সঙ্গে মিলে নিজেদের প্রয়োজনটা নিজেরা মিটিয়ে নেওয়ার স্বাধীন জীবন কাটিয়েছিল, আমাদেরও সেই শিক্ষাই দিতে চেয়েছিল। সে শিক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা পার্টি আর সরকারবাবুদের অনুগ্রহের জন্য হাত পেতে বসে থাকার পথ নিতে যাচ্ছি? যদি তোমরা তাই নিতে চাও তবে আর আমি কী বলব?

একটানা বলতে বলতে ধানুয়ার গলা রুদ্ধ হয়ে আসে। সে চুপ করে যায়। তার চোখের দৃষ্টি আবার হালকা হয়ে সামনের মানুষজনদের থেকে ভেসে উঠে দূরের পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে যায়। বাকিদের মুখে নানারকম অভিব্যক্তি। কারও মাথা ভারী হয়ে ঝুঁকে পড়েছে, বেদনার রেখা নড়াচড়া করছে মুখের রেখায়। কারও বা মুখে অস্পষ্ট বিরক্তির ছাপ। কিন্তু কেউ আর কোনও কথা বলে না। একে একে সবাই সভা ভেঙে চলে যায়। ধানুয়া কেবল অনড় হয়ে বসে থাকে।

ষোল
ভোটের খেলা

ধানুয়া এখন সবার বিরাগের পাত্র। হরেকৃষ্ণবাবু আর তাঁর পার্টির লোকজনরা ঠাওর করেছে যে ধানুয়াই তরুণদের খেপিয়ে তুলে দল পাকিয়ে বিরোধী পার্টির দিকে ঠেলে দিয়েছে। এদিকে সেই বিরোধী পার্টি অর্থাৎ প্রকাশ গোলের লোকজনের কানেও পৌঁছেছে যে ধানুয়া তাদের উন্নয়নের পথকে জঙ্গল-নদী-পাহাড় ও টোটো জীবন-সংস্কৃতির মৃত্যুর পথ বলে ঘোষণা করেছে, ফলে তারাও টোটোদের দলে ভেড়ানোর পথে ধানুয়াকে বাধা হিসেবে দেখছে। ভোট-খেলুড়ে এই দুটো পার্টিই তাদের ঝান্ডাবাহীদের দিয়ে প্রচার চালিয়ে ধানুয়াকে নেশাড়ু মাতাল ফালতু লোক হিসেবে দাঁড় করাতে চাইছে। টোটো তরুণদের মধ্যে একটা বড় অংশও ধানুয়াকে পুরানো দিন নিয়ে মজে থাকা এক সেকেলে লোক হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে। সেই তরুণদের মনে দোল তুলেছে টাকাপয়সা-ভোগবিলাস-চাকরি-শহরজীবনের হাতছানি। জঙ্গল-নদী-পাহাড়ের সঙ্গে তাদের জীবনকে জড়িয়ে রাখতে তারা অত উৎসুক নয়। ফলে তারাও ধানুয়াকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। টোটোদের মধ্যে তরুণ বা বয়স্ক অল্প যে কয়েকজন এখনও ধানুয়ার টানে জড়িয়ে আছে, তারাও খুব মুখ খুলবার ভরসা পায় না। বাবুসভ্যতার আক্রমণে জঙ্গল-পাহাড়-নদী-প্রকৃতির গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়া ক্ষতগুলোকে নিরাময় করে জীবজন্তু-পাখি-পাখালির সঙ্গে মিলে প্রকৃতির কোল থেকে নিজেদের প্রয়োজনটুকু ভাগ-বাটোয়ারা করে জোগাড় করে নেওয়ার পথ সামনের তিন বা পাঁচ বছরে কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় তার কোনও সহজ ছক তো ধানুয়ার কাছে নেই, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর কাছেও নেই, আছে শুধু নাছোড় ইচ্ছা। শুধু ইচ্ছা কোনও কদর পায় না, ভোটের

যুগে ভোটের পার্টিগুলো সব সামনের পাঁচ বছরে কী করে দেবে তার ফিরিস্তি দেয়, সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষের মনোযোগ পেতে হলে ওরকম পাঁচ-বছরে সম্পন্ন করা যাবে এমন কোনও ফিরিস্তি দিতে হয়। ধানুয়াদের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সুতরাং টোটোপাড়া জুড়ে ভোট-খেলুড়ে দুই পার্টির শিবিরে ভাগ হয়ে ভোটের খেলা শুরু হয়ে গেল, টোটোরাও তাতে জড়িয়ে পড়ল। টোটো তরুণদের মধ্যে থেকে ওয়াংসু, নরবু আর গেঠে এবং বয়স্কদের মধ্যে থেকে নিকল আর রণে প্রকাশ গোলের পার্টির মুখিয়া হয়ে উঠল, টোটোপাড়ার মঙ্গরগাঁওয়ের নেপালিদের একটা বড় অংশও তাদের সঙ্গে এল। ফলে হরেকৃষ্ণবাবুরা আগের মতো গায়ের জোরে চোখ রাঙিয়ে বা একজন-দুজনকে পুলিশের গারদে ঢোকানোর বন্দোবস্ত করে তাদের মোকাবিলা করার পথ নিল না। হরেকৃষ্ণবাবুরা নেপালি আর টোটোদের মধ্যে বিভাজনকে ব্যবহার করার কৌশল নিল। তারা প্রচার করতে শুরু করল যে প্রকাশজীর দলে যাওয়া টোটোরা আসলে জাপেনদের টোটোপাড়া থেকে উৎখাত করার ফন্দি আঁটছে, আজ তারা বাঙালি বা বিহারী জাপেনদের উৎখাত করার জন্য নেপালিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, এতে সফল হলে তারপর তারা নেপালি জাপেনদের বিরুদ্ধে হামলা শুরু করবে। হরেকৃষ্ণবাবুদের প্ররোচণায় দুই-একটা ছোটখাট টোটো-নেপালি হাতাহাতি-মারামারিও ঘটে গেল। কিন্তু বড়সড় মারদাঙ্গা তারা বাঁধাতে পারল না কারণ প্রকাশজীর ভোট-কুশলীরা পাল্টা চালে সব সামলে নিতে পারল।

ভোটগ্রহণের শিবির বসল টোটোপাড়ার স্কুলে। দুই পক্ষই নিজেদের লোকলস্কর নিয়ে সেখানে নজরদারির তাঁবু ফেলল। সরকারি বাবুরা এলেন ভোটগ্রহণের যন্ত্র নিয়ে। সঙ্গে রাইফেল হাতে উর্দিধারী সেনা। সকাল থেকেই ভোট দেওয়ার লাইন পড়ে গেল। হরেকৃষ্ণবাবু আর প্রকাশজীর মধ্যে ভোটের লড়াই নিয়ে উত্তেজনার পারদ বেশ চড়েছিল, তাই এবার ভোট দেওয়ার জন্য সবারই খুব উৎসাহ। পুদুয়া আর হিসপা পাহাড়ের চূড়া থেকেও যখন শেষ আলোর রেশ মিলিয়ে গেছে, সেই সাঁঝের মুখে ভোটগ্রহণ শেষ হল। ভোটের যন্ত্রগুলো স্কুলেরই একটা ঘরে ঢুকিয়ে দরজা সিল করে দেওয়া হল। দরজার সামনে গোটা রাতের জন্য সেনারা পাহারায় থাকল। সরকারি বাবুরা রাত কাটাতে বনবাংলোয় গেলেন। পরদিন সকালে সরকারি বাবুরা ও সেনারা ভোটবাক্স নিয়ে সরকারি জিপে চড়ে চলে গেলেন। আরও

সব কেন্দ্রের ভোটের সঙ্গে মিলিয়ে গণনা হবে পাঁচদিন পর আলিপুরদুয়ারের গণনাকেন্দ্রে।

হরেকৃষ্ণবাবু আর প্রকাশজী— দুই শিবিরেরই দাবি যে তারাই জিতবে। ভোটগণনার দিন দুই শিবিরের হয়েই বেশ কয়েকজন টোটো আলিপুরদুয়ারের গণনাকেন্দ্রের সামনের চাঁদোয়া ঘেরা মাঠে হাজির হল। তাদের আসা-যাওয়া–খাওয়া-হাতখরচা বাবদ টাকা পার্টি জুগিয়েছে। হরেকৃষ্ণবাবুর দলের হয়ে গেদু টোটো আর কাজি তামাঙ-য়ের নেতৃত্বে এসেছে দশ-বারো জন। আর প্রকাশজীর দলের হয়ে ওয়াংসু টোটো, নরবু টোটো-র নেতৃত্বে এসেছে কুড়িজন। আরও কত এলাকা থেকে কত লোক এসেছে। প্রার্থীরাও লোক-লস্কর-পার্টিপতাকা পরিবৃত হয়ে এসেছে। অস্থায়ী খাওয়ার দোকান, চায়ের দোকান, এমনকি আড়াল-করা মদের দোকানও আজকের জন্য খুলে গেছে মাঠ ঘিরে। ওয়াংসুদের মনে হল, এ যেন প্রায় হ্যামিলটন গঞ্জের মেলার মতোই ব্যাপার, দোকানপাট যা একটু কম।

সকাল ন-টা থেকে শুরু হল ভোটগণনা। রাউন্ডের পর রাউন্ড ভোটগণনা চলে। প্রতি রাউন্ডের পর এগিয়ে থাকা-পিছিয়ে পড়ার হিসেব ঘোষণা হয় মাইকে। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে থাকা পার্টির লোকজন হুল্লোড় করে পার্টির স্লোগান তুলতে থাকে, পার্টির পতাকা শূন্যে তুলে নাড়তে থাকে। অনেক কেন্দ্রের ভোটগণনাই হচ্ছে এখানে। উত্তেজনা সবগুলো ঘিরেই। তবু হরেকৃষ্ণবাবু-প্রকাশজীর লড়াই যেন টানটান উত্তেজনায় সবাইকে ছাপিয়ে যায়। এক রাউন্ডে হরেকৃষ্ণবাবু এগোন তো পরের রাউন্ডে প্রকাশজী এগিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে ব্যবধান কয়েক শো থেকে হাজার ভোটের মধ্যে ঘোরাফেরা করে— শেষ অবধি কে জিতবে তা নিয়ে উৎকণ্ঠা কাটে না। বেলা শেষ হয়ে সন্ধ্যাও গড়িয়ে যায়। স্লোগান হেঁকে হুল্লোড় করে ওয়াংসু-নরবুদের গলা বসে গেছে। পার্টির ব্যবস্থাপনায় দুপুরে সবাই প্যাকেট-করা বিরিয়ানি খেয়েছে, মাঝে মধ্যে গিয়ে মদও খেয়েছে প্রচুর। দেহের প্রতিটি শিরা যেন উত্তেজনার টানে ধনুকের ছিলার মতো টান হয়ে আছে। রাত দশটার সময় সব ভোট গোনা শেষ হওয়ার পর শেষাবধি পাকা ঘোষণা হল যে প্রকাশজী আটশোর মতো ভোটে হরেকৃষ্ণবাবুকে হারিয়ে দিয়েছে। টানা কুড়ি বছর জেতার পর এই প্রথম হরেকৃষ্ণবাবু হারল। প্রকাশজীর সমবেত সমর্থকদের সঙ্গে ওয়াংসু, নরবু সহ জনাকুড়ি টোটোও

আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। এক অভাবনীয় জয় যেন তারা হাসিল করেছে। এ যেন কেবল প্রকাশজীর ভোটে জেতা নয়। এ যেন তাদের প্রত্যেকের জীবনের গভীর থেকে উঠে আসা কোনও জয়। স্পষ্ট করে তারা বলতে পারবে না যে কী জয়, কীসের জয়। কেবল তাদের বুকটাতেও যেন আর আঁটে না, ছাপিয়ে উঠে হাউড়ির হড়কা বানের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় জিতে যাওয়ার আনন্দ। তামাঙ, নেওয়ার, মঙ্গর, রাজবংশী, বাঙালী— আরও কত জনজাতির তাদেরই মতো তরুণও তাদের সঙ্গে হুল্লোড় করছে, তাদের সবার বিভিন্ন ভাষা, উল্লাসের বিভিন্ন ধরণ একসাথে মিশে যাচ্ছে, এই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে তাদের আর হুঁশ রইল না। রাতেই বিজয়মিছিল হল, আবির মাখামাখি হল, আরও খাওয়াদাওয়া হল, আরও মদ খাওয়া হল, কিন্তু কী কী যে ঠিক ঘটেছিল তা পরের দিন সকালে আর কেউ আলাদা করে মনে করতে পারছিল না।

সতের
খেলাশেষের শূন্যতা

ভোটে হারার পর হরেকৃষ্ণবাবু তাঁর নিজের পার্টিতেই গুরুত্ব হারিয়ে পরিত্যাজ্য হয়ে গেছেন। হরেকৃষ্ণবাবুর পার্টিও কেমন ফুটো হয়ে যাওয়া বেলুনের মতো চুপসে গিয়েছে। তাঁর পার্টির ঝান্ডা ছেড়ে ঝান্ডাধারীরা দলে দলে প্রকাশজীর দলের ঝান্ডা তুলে নিয়েছে। পয়সাওলা বাবু লোকজন, কন্ট্রাকটর, ব্যবসায়ী যারা হরেকৃষ্ণবাবুর বা তাঁর পার্টির ফান্ডে ভেট পাঠাতেন, তাঁদের ভেট এখন প্রকাশজীর কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছে।

টোটোপাড়ায় গেদু টোটো, কাজি তামাঙদের দিন শেষ, তারা এখন প্রায় অবসর নিয়েছে বলা যেতে পারে। টোটোদের মধ্যে ওয়াংসু টোটো আর মঙ্গরগাঁওয়ের প্রতাপ লামা প্রকাশজীর পার্টির প্রধান প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। প্রথমে ওয়াংসু টোটোকে এবং তারপর আরও দুই-তিনজনকে পার্টির কাজ চালানোর সুবিধার জন্য পার্টি থেকে নতুন মোটরবাইক আর নতুন স্মার্টফোন দেওয়া হয়েছে। সরকারের গৃহনির্মাণ সহায়তা প্রকল্প, কৃষিসহায়তা প্রকল্প, তফশিলি জাতি সহায়তা প্রকল্প বা অধুনা হোম-স্টে চালানোর জন্য সহায়তা প্রকল্পে কার নাম যাবে, কটা নাম যাবে, কে পাবে, কে পাবে না তা এখন গেদু আর কাজির বদলে ওয়াংসু আর প্রতাপ মিলেই ঠিক করে। অসন্তোষ, স্বজনপোষণের অভিযোগ আবার নতুন করে নতুন দিকে মুখ ফিরিয়ে জমতে শুরু করেছে।

প্রকাশজীর পার্টির দেওয়া উন্নয়নের ফিরিস্তি যাদের স্মরণে আছে, যারা তা নিয়ে কখনও সখনও প্রশ্ন করে বসে, তাদের বলা হয় যে সব হবে, তবে সময় লাগবে, নানা প্রতিকূলতার মধ্যে প্রকাশজীর পার্টিকে কাজ করতে হচ্ছে বলেই সময় লাগছে, দেশজুড়ে প্রকাশজীর পার্টি আরও ভোটে জিতে

আরও ক্ষমতা পেলে সব তাড়াতাড়ি হতে থাকবে। তাই মাদারীহাট থেকে টোটোপাড়া অবধি রাস্তার এখনও হাল ফেরেনি, নদীখাতগুলোর উপর পাকা সেতু হয়নি, বর্ষায় এখনও চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। টোটো যুবকদের জন্য সরকারি চাকরির দরজাও কোথাও খুলে যায়নি।

তবে আগের ধারা বজায় রেখেই দিনের পর দিন জঙ্গল আরও ফাঁকা হচ্ছে। নদীখাতগুলো থেকে বোল্ডার তুলে পাচার আরও বাড়ছে, ফলে নদীখাতগুলো ক্ষতে ভরে উঠেছে, পাড় ধ্বসে পড়ছে জায়গায় জায়গায়। পাহাড় কেটে পাথর চালান করার ব্যবসাও ক্রমশ বাড়ছে। ফলে টোটোপাড়ার এখানে-ওখানে ধস নামছে। বসতভূমি, চাষজমি ধসিয়ে নিয়ে সেই ধস নদীখাতগুলোয় এসে পড়ছে, নদীর প্রবাহ রুদ্ধ হচ্ছে। আর ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে পানীয় জলের সমস্যা। একসময় যে অসংখ্য ঝোরা স্বচ্ছ পানযোগ্য জলের ধারা বয়ে আনত, সেগুলো শুকিয়ে আসছে। একসময় যে ঝোরা দিয়ে সারাবছর জল বইত, এখন কেবল বর্ষাতেই তার প্রবাহ থাকে, আর বর্ষার জলও হয় কাদাগোলা, পানের অযোগ্য। উঁচু পাহাড়ে গাছ কমে যাওয়া, ধস নামা, নাকি আর কী যে এই ঝোরা শুকিয়ে যাওয়ার কারণ তা কেউ এখনও খুঁজে দেখেনি, তবে আর কয়েক বছরের মধ্যেই টোটোপাড়ায় এটা একটা জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

টোটোপাড়ার ক্রমশ শুকিয়ে আসা ঝোরাগুলোর পাশে পাশে ধানুয়া ঘুরে বেড়ায়। তার অতি অসহায় মনে হয় নিজেকে। নিজের অসহায়তার জন্য নিজেকেই গালি দেয়। যে মায়ের কোলে সন্তান থাকতেও বুকের দুধ শুকিয়ে আসে, সেই মায়ের দেহে যে কঠিন রোগ বাসা বেঁধেছে তা নিশ্চয়, সেই মা আর তার সন্তান কারওরই আর বাঁচার পথ থাকে না। আর প্রকৃতি মায়ের দেহে এই রোগের বাসা বাঁধিয়েছে তো তার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে অবুঝ যারা সেই মানুষরাই। এর ফলে মানুষও মরবে আর মায়ের অন্যান্য সন্তান পশু-পাখি-মাছেরাও মরবে। মানুষের কি তবু হুঁশ আছে? ‘উন্নয়ন’-য়ের নামে প্রকৃতিকে খাবলে খুবলে তারা এই রোগকেই আরো গভীর করছে।

আঠার
ধানুয়ার প্রস্থান

আজ দেমসায় বাৎসরিক পুজোর দিন। গোটা টোটোসমাজের জড়ো হওয়ার দিন। ধানুয়ার ছোটবেলায় এই পুজো চলত দুই-তিনদিন ধরে। টোটোপাড়ার সব গ্রাম থেকে সব টোটোরা এই টানা দুই-তিনদিন এই দেমসার কাছে এসে অস্থায়ী ঘর তুলে থাকত। সঙ্গে নিয়ে আসত ঘরে তৈরি ইউ আর কাইন, শাকসবজি। একসঙ্গে সবাই মিলে চলত পুজো, নাচগান, খাওয়াদাওয়া। এখন আর তা হয় না। সবাই আসে না, এমনকি পুজো চালানোর চাঁদাও চেয়ে চেয়ে সবার কাছ থেকে পাওয়া যায় না। খণ্ডিত চেহারায় হলেও পুজো তবু টিকে আছে, পুজোর দিন বেশ কিছু টোটো এখনও জড়ো হয়।

ধানুয়া আজ ভোরে অন্ধকার থাকতে উঠে পড়েছে। নদীতে স্নান করেছে। তারপর তার ঘরের পুরানো তোরঙে যত্ন করে রাখা টোটোদের পরম্পরাগত আদি পোষাক বের করে পরেছে। এই পোষাক হল লম্বা একখণ্ড সাদা বস্ত্র। কোমরে একপাক বেঁধে বুকের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘাড়ের পিছন দিয়ে ঘুরিয়ে এনে বাঁধতে হয়। কত না বছর আগে, ধানুয়ার দিদিমা যখন যুবতী ছিল, তখন এই বস্ত্র সে ঘরে বুনেছিল। তখন টোটোদের ঘরে ঘরে এভাবে গাছ-গাছড়া থেকে পাওয়া উপাদান থেকে সুতো তৈরি করে বস্ত্র বোনার কৌশল জানা ছিল। সেই জ্ঞান এখন হারিয়ে গেছে। কতদিনের পুরানো এই পোষাক। ধানুয়ার দাদু-বাপ-কাকারাও তা গায়ে চরিয়েছে। আজ তো ধানুয়াও বুড়ো হয়ে গেল। তবু কোথাও কোথাও সুতোর বুনট কিছুটা পাতলা হয়ে এলেও বস্ত্রখণ্ডটি এখনও অটুট আছে। বস্ত্রখণ্ডটি পরে ধানুয়া তার বাড়ির উঠোনে দিদিমার বসিয়ে যাওয়া লামপাতি গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। কুয়াশার মধ্য দিয়ে মৃদু আলো তখন জাগতে শুরু করেছে। লামপাতি গাছের পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠে এক

শিরশিরানি হাওয়া ধানুয়ার সারা গায়ে বুলিয়া দেয়। ধানুয়ার চোখ বুজে আসে। দিদিমার আদরের স্পর্শ যেন সে অনুভব করে দেহ-মন জুড়ে। তারপর যে সুপুরি বাগানের মধ্যে চম্পাকলির কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে কবরের পাশে, কবরের উপর পাথরফলকটায় ঝুঁকে পড়ে মাথা রাখে। আলো তখন আরও একটু ফুটেছে, তবে ধানুয়ার চোখে জল ভরে গিয়ে সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কবরের পাথরফলকে মুখ গুঁজে ধানুয়া যেন সেই পাথর ভেদ করে গভীরের কাউকে শোনাতে চায়:

চম্পা, তোমার-আমার মিলনস্থল ছিল জঙ্গল, সেখানে গিয়েই আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হব কথা দিয়েছিলাম। কী যে কাজের মায়ায় এত দেরি করে ফেললাম। আর নয়। আজ দিনশেষে জঙ্গলে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

সুপুরিবাগান থেকে বেরিয়ে ধানুয়া দেমসার পথ ধরে। ভোরের আলো তখন বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে। ছোটবেলায় বাপ-কাকাদের হাত ধরে পুজোর দিন দেমসায় যাওয়ার স্মৃতি এখন তার মনে ভিড় করে আসছে। সারা রাত জেগে থাকত, ঘুম কাছে ঘেঁষতে পারত না। অন্য মাঝবয়সী টোটো মহিলাদের সঙ্গে তার মা সারা রাত ধরে অঞ্চু-ঙয়ু-সরদে পুজোর গান গাইত, নাচত। তার বাবা, কাকা, জেঠামশাই ও অন্য টোটো বয়স্ক পুরুষরাও কি চুপ করে বসে থাকার লোক? তাদেরও নাচ-গান চলত সারারাত। তারা গাইত নৌকার গান, জঙ্গলের গান। সেই গানগুলো ছিল খুব লম্বা। তার জেঠামশাই কালুরাম টোটো আর জুরু টোটো ছিল এইসব নাচগানের ওস্তাদ। তারা খোলা গলায় গানের ধুয়ো ধরে একবার নাচের পা ফেললে কারও আর স্থির হয়ে বসে থাকার উপায় থাকত না। সবাই গলা মেলাত, সবার কোমর আর পা উঠত দুলে। কোথা দিয়ে যে রাত কেটে যেত বোঝা যেত না। এই মানুষরা সব চলে গেছে। আজকাল পুজোয় নাচগান হলেও, তাতে সেই প্রাণের টান মেলে না, সব যেন আনুষ্ঠানিকতায় ভরা। সেই দিনের গানগুলোও এখন একজন-দুজন ছাড়া আর কেউ গাইতে পারে না, সেসব গানের ভাষাও আজকের তরুণ টোটোদের কাছে অনেকটাই অজানা হয়ে গেছে। সেসব গানের বেশিরভাগ টোটো শব্দের মানে আজকের তরুণ টোটোরা জানে না। তাই কেবল প্রাণের টানের ক্ষয় নয়, মাতৃভাষার ক্ষয়ও ধানুয়ার মনকে বেদনায় ভারী করে তোলে।

ধানুয়া যখন দেমসায় পৌঁছল, পুবদিকের পাহাড় আর জঙ্গলের মাথায় আকাশে লালের ছোপ ছড়িয়েছে, কুয়াশা গলে গিয়ে ভেজা-ভেজা পবিত্র স্নিগ্ধতায় প্রতিটা পাথর, প্রতিটা ডালপালা, প্রতিটা পাতা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কাইজি (প্রধান পুরোহিত) আর গাপপু (সমাজ-প্রধান)এসে পৌঁছয়। একে একে জড়ো হয় আরও বেশকিছু নারী ও পুরুষ, যুবতী আর যুবক। পরম্পরাগত আদি টোটো পোষাক পরে কাইজি দেমসার মন্দিরে প্রবেশ করেন প্রথমে, মন্দিরের চালা থেকে ঝোলানো পবিত্র দুটি ঢোলক নামিয়ে আনেন। তা বাজিয়ে প্রথাগত মন্ত্র উচ্চারণ করে গান গেয়ে পুজোর সূচনা ঘোষণা করেন। সমবেত টোটোরা পুজোয় মেতে ওঠে।

দেমসা প্রান্তরের মাঝে ধানুয়াকে ঘিরে বিভন্ন বয়সের টোটোদের ভিড় ক্রমে জমে ওঠে। ধানুয়া টোটোদের পরম্পরাগত গান গাইতে শুরু করেছে। আজ যেন তার উপর কেউ ভর করেছে। বয়স্করা অবাক চোখে দেখে আর ভাবে, এ কি ধানুয়া নাকি ধানুয়ার শরীরে ঢুকে তার জেঠামশাই ওস্তাদ কালুরাম আবার গান গাইছে, নাচের দোলে দুলছে! ইউর বাটি ভরে ওঠে, চুমুকে চুমুকে শেষ হয়, আবার ভরে ওঠে। ধানুয়ার গান থামে না। নচুয়া, নিকল, রণে, শনে-রাও ধানুয়ার গলায় গলা মেলায়, গানের ধুয়ো ধরে, নাচের দোলে দুলতে থাকে। অল্পবয়সী যুবক-যুবতীরাও অবাক হয়ে শোনে। ধানুয়া মাঝে থেমে এই তরুণ টোটোদের জন্য পুরানো গানের না-বোঝা কথাগুলো ব্যাখ্যা করে দিতে থাকে। ধীরে ধীরে তরুণ-তরুণীরাও তার গানে মজে নাচে দুলে ওঠে।

ধানুয়ার মনের গহন থেকে, স্মৃতির তোরঙ থেকে আপনা আপনিই যেন একের পর এক গান ভেসে ওঠে— তার দাদু-দিদিমা, বাপ-জেঠাদের কাছে শোনা গান। বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। পশ্চিমের আকাশে লাল ছোপ লাগিয়ে আলো ঝরে যাচ্ছে। আলো কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আরও গাঢ় হয়ে উঠছে আবেশ। ধানুয়ার ভিতর থেকে ভেসে উঠে এসে তার কন্ঠে ভর করল তার মা-দিদিমার কাছ থেকে শোনা একটা গান। এই গান খুব পুরানো। টোটোরা যখন জঙ্গলের একটা অংশ সাফ করে অস্থায়ী চাষের জায়গা করে কাইন চাষ করত, এ সেই সময়কার সেই চাষের গান। এই গানের মধ্যে দিয়ে টোটোরা জঙ্গলের কাছে অনুমতি চাইছে চাষের জন্য, জঙ্গলের সেই অংশে বাস করা সব পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গকে বলছে যে কাইন চাষ করে খাদ্য

জোটানোর জন্য এই জায়গাটা তাদের সাফ করতে হচ্ছে, সেজন্য পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গদের কয়েক বছর বাসের অসুবিধা হবে, খাবারের অসুবিধা হবে, তার জন্য যেন তারা টোটোদের ক্ষমা করে দেয়, এই তিন-চার বছর তারা যেন জঙ্গলের অন্যত্র গিয়ে বাসা বাঁধে, খাবার জোগাড় করে। গানে জঙ্গলের কাছে প্রার্থনা জানানো হচ্ছে যে তিন-চার বছর পর টোটোরা যখন এজায়গা ছেড়ে অন্যত্র চাষ করতে চলে যাবে, তখন এই জায়গায় গাছ যেন আবার বেড়ে ওঠে, লতাপাতা যেন আবার গাছকে জড়িয়ে মাথা তোলে আর পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গরা যেন আবার সেখানে ফিরে আসতে পারে। লম্বা এই গানটা গাইতে গাইতে গানের কথার সঙ্গে আপনা থেকেই ধানুয়ার মুখে নতুন নতুন কথা জুড়ে যায়। ধানুয়া সমস্ত টোটোজাতির হয়ে জঙ্গলের কাছে পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গের কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে সরকারি বাবু আর কাঠচালানকারীদের হাত থেকে জঙ্গলকে না বাঁচাতে পারার জন্য, রাস্তা-রেললাইন-বনবাংলো করে জঙ্গল ধ্বংস আর পশুদের থাকার জায়গা কেড়ে নেওয়ার জন্য, পাথর-নুড়ির ব্যবসা করে পাহাড়-নদী ধ্বংস করার জন্য। সবাই স্তব্ধ হয়ে শোনে। ধনীরাম যেন গানের মধ্য দিয়ে এক গহন বেদনা-অসহায়তা উগরে দিচ্ছে আর জঙ্গলমায়ের দুই পায়ে মাথা কুটে ক্ষমাভিক্ষা করছে। এই গান যেন আর শেষ হবে না, এই বেদনা যেন আর বুকের ভিতর আগল এঁটে রাখা যাবে না। তার চারপাশে জড়ো হওয়া প্রতিটা টোটো বয়স নির্বিশেষে যেন এই গানের বাঁধনে বাঁধা পড়ে স্তব্ধ নির্বাক হয়ে যায়। রাত তখন গড়িয়ে গেছে। অবশেষে ধনীরাম গান থামায়। তার চারপাশের টোটোদের দিকে তাকায়। বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের উপর তার দৃষ্টি থামে। গান নয়, তবু যেন সেই গানেরই ধারাবাহিকতায় যেন সে ধীরে ধীরে বলে:

আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমি এবার জঙ্গল মায়ের কাছে ফিরে যাব। পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ যেমন বাঁচে তেমনভাবে বাঁচব। তোমাদের বয়স আছে। জঙ্গল বাঁচিয়ে পাহাড় বাঁচিয়ে নদী বাঁচিয়ে তাদের কোলে অন্য পশুদের সঙ্গে মিলেমিশে বাঁচার যে পথ আমাদের বাপ-ঠাকুরদা বলে গিয়েছিল, সেই পথে ফেরার চেষ্টা করবে কি করবে না তা এখন তোমাদেরই ঠিক করতে হবে। যদি সেই চেষ্টা কেউ না করে বা তা বিফলে যায় তবে জঙ্গল-পাহাড়-নদী মরবে, তাদের মেরে মানুষও বেঁচে থাকবে না। সবকিছু ধ্বংস হলে সেংজা আবার নিজের নিয়মে জঙ্গল-নদী-পাহাড়ের জন্ম দেবে। সেই যুবতী মায়ের

কোলে নতুন সন্তান হিসেবে নতুন জীব-জন্তু-মানুষের জন্ম হবে, তাদের জীবনধারায় আবার আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনধারা ফিরে আসবে। সেই নতুন দিনে হিসপা থেকে পুদুয়া পাহাড় অবধি এক রামধনু দেখা দেবে। সেই রামধনুর মধ্যে থাকব আমি।

সবাই শোনে। বুঝতে পারে না। একি সুরে না গাওয়া কোনও গানের কথা। নাকি ইউ-য়ের নেশা মাথায় চড়ে যাওয়া কোনও বৃদ্ধের প্রলাপ। কেবল ধানুয়ার দীর্ঘদিনের সাথী নচুয়া, নিকল, রণে আর শনের দুচোখ জলে ভরে যায়। তারা বুঝতে পারে ধানুয়া আজ তাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত আর বদল হওয়ার নয়। তারা তাই ধানুয়াকে তার সিদ্ধান্ত বদলের কথা বলে না। বন্ধুর সঙ্গে শেষ মুহূর্তগুলোর নিবিড়তা শেষবিন্দু অবধি শুষে নিতে তারা ধানুয়ার গা ঘেঁষে আরও ঘন হয়ে আসে।

রাত্রি এখন শেষের দিকে। পুবের দূর আকাশের রঙ যেন একটু ফিকে হচ্ছে। দেমসার মাঠ থেকে সবাই সবার মতো ফিরে গেছে। নচুয়া, নিকল, রণে আর শনে ধানুয়ার সঙ্গ ছাড়েনি। ধানুয়া দেমসা থেকে হাঁটতে শুরু করে পঞ্চায়েত গাঁও হয়ে লঙ্কাপাড়ার জঙ্গলের রাস্তা ধরে হাউড়ির দিকে হাঁটা লাগিয়েছিল। তার চার বন্ধু তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেছে। কোনও কথা কেউ বলতে পারেনি। পাঁচজনই যেন নিজেদের মনের কোন গভীরে ডুবে আছে। এখন তারা হাউড়ির ধারে এসে পৌঁছেছে। পাহাড়-জঙ্গলের মাঝে এই উন্মুক্ত নদীখাত অসংখ্য পাথর বুকে নিয়ে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। এক ফোঁটা জল নেই কোথাও। দুই পারের গাছের পাতাগুলোও যেন পাথরের তৈরি। একটা পাতাও নড়ছে না। অন্ধকার হালকা হয়ে জেগে ওঠা ফিকে আলোও যেন পাংশু, নির্জীব। সব পাখি যেন বোবা হয়ে আছে, সব জন্তু যেন বোবা হয়ে আছে, চরাচরে একবিন্দু শব্দের অস্তিত্ব নেই। পাঁচজনে তারা হাউড়ির বুকে পাথরের উপর বসল ঘন হয়ে। একে অপরের আলিঙ্গনে পাঁচটা পুরুষ-দেহ এক হয়ে গেল। দশটা চোখ ভিজে উঠে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু নেমে এসে নির্জলা হাউড়ির তৃষ্ণার্ত বুকে মিলিয়ে গেল। অখণ্ড নীরবতা ভেঙে ধানুয়ার স্বর ভেসে উঠল: বন্ধু, এবার আমায় একা যেতে হবে, তোমরা ফিরে যাও।

হাউড়ির বুকে চারটি স্থির মূর্তি দাঁড়িয়ে রইল। ধানুয়া ধীর পায়ে হাউড়ির খাত পার হয়ে ওপারের জঙ্গলে ঢুকে গেল। ভোরের প্রথম আলোটুকু গায়ে মেখে ধানুয়ার দেহটি জঙ্গলের মধ্যে মিশে গেল।

উনিশ
উপসংহার

দেমসায় পুজোর পরের দিন সকালে টোটোপাড়ায় মাদারীহাট থানা থেকে জিপভর্তি পুলিশ এল। মুখে মুখে তখন ছড়িয়ে গেছে যে ভোররাতে হল্লাপাড়া বিট অফিস আর তিতি বনবাংলো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মানুষজন কেউ মরে নি। গুটিকয় গার্ডের ঘুম আগুনের তাপে ভেঙে গিয়েছিল। তারা কোনওমতে আগুনের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে সাদা কাপড় জড়ানো একটা বুড়ো লোক টোটো ভাষায় উচ্চস্বরে মন্ত্রের মতো কীসব উচ্চারণ করে যাচ্ছে। হতচকিত গার্ডরা জঙ্গলের আধো-অন্ধকারে এই অদ্ভুত সাদা কাপড় জড়ানো মূর্তি দেখে ভূতপ্রেত জাতীয় কিছু ভেবে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারা নিজেদের প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়েছিল। খবর পেয়ে বনরক্ষী বাহিনি যখন দলবল নিয়ে সেখানে হাজির হয়, তখন অফিস আর বাংলো পুড়ে ছাই, সেই সাদা কাপড় জড়ানো বুড়োকেও আশেপাশে তল্লাশি করে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সকালে তাই টোটোপাড়ায় পুলিশ আর বনরক্ষীবাহিনির যৌথ দল এসে হাজির।

খোঁজ করে জানা গেল যে ধানুয়া রাতে জঙ্গলের দিকে গিয়েছিল, আর বাড়ি ফেরে নি। সব সন্দেহ গিয়ে পড়ল ধানুয়ার উপর। তার সঙ্গে যে চারজন ভোর অবধি ছিল, সেই নচুয়া, নিকল, রণে আর শনে-কে গ্রেফতার করে পুলিশ নিয়ে গেল। যে সময় অফিস আর বাংলোয় আগুন লেগেছিল, সেই সময় এই চারজন যে তাদের বাড়িতেই ছিল তা তাদের বাড়ির লোকজন থেকে শুরু করে পাড়াপড়শি সবাই একবাক্যে সাক্ষ্য দিল। তবু পুলিশ তাদের হাজতে রাখল ধানুয়া সম্পর্কে খোঁজ পাওয়ার জন্য। কিন্তু দিনের পর দিন গোটা লঙ্কাপাড়া জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও জীবিত বা মৃত কোনও

অবস্থাতেই ধানুয়াকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনমাস পরে পুলিশ-বনরক্ষীরাও হাল ছেড়ে দিল। নচুয়া, নিকল, রণে আর শনেকেও ছেড়ে দিল, তারা টোটোপাড়ায় ফিরে এল।

বিট অফিস আর বনবাংলোয় আগুন কি ধানুয়াই লাগিয়েছিল? জঙ্গল-পাহাড়ের ধ্বংস ডেকে আনা সভ্যতার বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহের জানান দিতেই কি জঙ্গলে মিশে যাওয়ার আগে সে ওই সভ্যতার দুটো প্রতীককে পুড়িয়ে দিয়ে গেল? কিন্তু কোথায় মিশে গেল ধানুয়া? তার খোঁজ কি আর কোনওদিন পাওয়া যাবে, নাকি সেই পুদুয়া পাহাড় থেকে হিসপা পাহাড় অবধি ছড়ানো রামধনুর জেগে ওঠার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে?

পরিশিষ্ট

সম্পাদকের কৈফিয়ত

এই উপন্যাসটির লেখক ধনীরাম টোটো। কিন্তু আবার সম্পাদক হিসেবে আরেকজনের নাম হাজির করা হয়েছে কেন? এই কৈফিয়ত দিতে গেলে উপন্যাসটি কীভাবে গড়ে উঠেছে তা নিয়ে কয়েকটা কথা বলতে হয়। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে ধনীরাম টোটো টোটোপাড়ায় দুটো ফুলস্কেপ খাতা আমার হাতে তুলে দেন। এই দুটি খাতার প্রায় দেড়শো পাতা জুড়ে তিনি লিখেছেন তাঁর উপন্যাস। তিনি উপন্যাস লিখছেন শুনে আগেই আমি তা পড়ার এবং প্রকাশ করার জন্য আগ্রহ জানিয়েছিলাম। তিনি খাতাদুটো আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেন যে প্রয়োজনমতো ঠিকঠাক করে নিয়ে তিনি এইটি প্রকাশের দায়িত্ব আমাকেই দিলেন। কলকাতায় ফিরে আসি। ভাষিক মানবাধিকারের পত্রিকা 'মাতৃভাষা'-য় 'ধানুয়া টোটোর কথামালা' নামে উপন্যাসের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয় ২০১৯-য়ের নভেম্বরে। কিছু বানান বা যতিচিহ্নের সংস্কার করা ছাড়া আর কোনও পরিবর্তন সেখানে আমি করি নি। এরপর ত্রৈমাসিক ওই পত্রিকায় উপন্যাসের কিস্তিগুলো বেরতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভূমিকা কিছু বদলাতে থাকে। মাঝে যেকবার টোটোপাড়ায় গিয়েছি, ধনীরাম টোটোর সঙ্গে উপন্যাস নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কোথাও কোথাও তিনি আগের লেখায় বদল ঘটাতে চান, কোথাও আরও বিশদিকরণ করতে চান, কোথাও টোটোপাড়ার প্রকৃতি বা টোটোজাতির ইতিহাসের প্রসঙ্গকে আরও বিস্তারিত করতে চান। সেসব আমাকে বোঝানোর জন্য কখনও তিনি লঙ্কাপাড়ার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমাকে হাঁটাপথে ঘুরিয়েছেন, ডয়ামারা গুহায় নিয়ে গেছেন, কখনও টোটোপাড়ার মধ্যেই বিভিন্ন গাছ, পাহাড়, নদী-ঝোরাকে দেখিয়েছেন-চিনিয়েছেন। কী পরিবেশ, কী প্রাকৃতিক বর্ণনা তিনি উপন্যাসে আনতে চাইছেন তা এভাবে বোঝানোর পাশাপাশি অনর্গল মৌখিক ভাষ্যে বলে গেছেন। কখনও অবশ্য লিখিত ভাবেও বেশ কিছু পাতা সংযোগ করেছেন। তিনি টোটোপাড়ায় আর আমি কলকাতায়— এই অবস্থাতেও বহুবার ফোনের মাধ্যমে উপন্যাসের কোনও না কোনও অংশের সংস্কার বা পরিবর্তনের ভাবনা বিশদে বলেছেন। আর সেই অনুযায়ী আমাকে দিয়ে

সংযোজন-বিয়োজন-পুনর্বিন্যাসের কাজ করিয়ে নিয়েছেন। ফলে আমার ভূমিকা আর কেবল বানান বা যতিচিহ্ন সংস্কারে আবদ্ধ থাকেনি। আমার এই ভূমিকাকে চলচ্চিত্রনির্মাণে চলচ্চিত্র-সম্পাদকের ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করেই বোঝানো যায় বলে আমার মনে হয়। চলচ্চিত্রের স্রষ্টা যেমন তার নির্দেশক, কিন্তু সেই নির্দেশকের সৃজনকে মূর্ত রূপ দিতে চলচ্চিত্র-সম্পাদককে কাটা-ছেঁড়া, পুনর্বিন্যাস-প্রতিস্থাপন, গ্রহণ-বর্জনের কাজ করতে হয়, এই উপন্যাসের লেখক ধনীরাম টোটোও আমাকে দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নিয়েছেন বলে আমার মনে হয়। সেখানে কোনও ত্রুটি হয়ে থাকলে তার দায় একান্তই আমার।

বিপ্লব নায়ক
আগস্ট,২০২১